এই ৪৭ বৎসর ব্যাপিয়া যে বামাবোধিনী জগতের সেবা করিয়া আসিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমিই নিশ্চিত জান, তোমার ইচ্ছায়, ইহা আর কত দিন এই পৃথিবীবাসীর সেবা করিবে।

কুসংস্কারাপন্না, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্না বঙ্গ বামাদিগকে যে বামাবোধিনী পত্রিকা উন্নতির পথ, জ্ঞানালোক দর্শন করাইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহা বর্ণপরিচয়ের স্বরবর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণের সূত্র এবং বিজ্ঞানাদি বিষয় সকল কিরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়াছে, তাহা ইহার পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ জ্ঞাত আছেন। ভগবান্ ইহাকে ইহার সেবাধর্ম্মে দৃঢ়ব্রতী করুন এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন।

তৎপরে আমরা ইহার জন্মদাতা সেই স্বর্গীয় আত্মাকে স্মরণ করি; তৎপরে যে মহাত্মা ইহাকে এই সুদীর্ঘকাল জীবিত রাখিয়াছিলেন, যাঁহার চেষ্টায় ইহা উন্নত হইয়াছে, তাঁহাকে স্মরণ করি; এবং তাহার পর ইহার জন্ম হইতে যে সকল লেখক, লেখিকা এবং গ্রাহক ও গ্রাহিকা (যাঁহারা কেহ কেহ ইহলোকে আর নাই) প্রবন্ধ এবং অর্থাদির দ্বারা ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসব।

আজ আবার সেই দিন, যে শুভলগ্নে বঙ্গবাসিনীগণের কল্যাণার্থে বামাবোধিনীর জন্ম হয়; যে দিন বঙ্গবাসিনীর হিতকামনায় এই পত্রিকা সোৎসাহে প্রকাশিত হইয়া ঘরে ঘরে বরণীয় হইয়া মঙ্গলগান করিয়াছিল। আজ সেই পুণ্যাহ তিথি; তাই আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বদেবের চরণে কুশল প্রার্থনা করিয়া ধন্য হইব। আজ বড় আনন্দের দিন! এই দিনে আমরা বামাবোধিনীকে পাইয়াছি। ইনি উজ্জ্বল দীপ হস্তে লইয়া জ্ঞানালোকে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচাইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা আজ বহুদূরে—অমরপুরে। তাঁহার রোপিত তরু ফল-ফুলে বামাকুল-উদ্যানে পরিশোভিত হইলে তাঁহার শ্রম সার্থক ও আশা পূর্ণ হইবে।

প্রতিষ্ঠাতা বিহনে বামাবোধিনীর দুর্ব্বল অবস্থা সমাগত বোধ হইতেছে। অতএব এই পবিত্র দিনে আমরা সকল ভগিনী একত্র হইয়া যেমন একদিন একদণ্ডে একবার বামাবোধিনীর উন্নতি কেবল প্রার্থনা করিলাম, তদ্রূপ প্রত্যহ দৈনিক উপাসনার সহিত সকল কার্য্যের মধ্যে একবার আমাদের চিরকুশলাকাঙ্ক্ষিণী

বামাবোধিনীর উন্নতির চিন্তা যেন করিতে পারি।

সকল কাজই শুধু চিন্তায় সম্পন্ন হয় না। কার্য্যে পরিণত করাই মানব-জীবনের সফলতা। বাঙ্গলাদেশে ও কলিকাতা মহানগরীতে এতগুলি কৃতবিদ্য ও বিদুষী মহিলা আছেন যে, অনায়াসে তাঁহাদের কৃপায় বামাবোধিনীর জীবন সহজে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে ও সেই স্বর্গীয় মহাত্মার সুকীর্ত্তি অখণ্ডভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। আমরা অতি নগণ্য, চিরদিন প্রবাসী; সুতরাং এই মহোৎসবে ভগিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া, এ আনন্দে যোগদান করিয়া সুখী হইতে পারিলাম না; কিন্তু ভরসা করি, আমার এই ঐকান্তিক বিনীত প্রার্থনা ভগবানের চরণে ও ভগিনীগণের সদনে গ্রাহ্য হইবে। বামাবোধিনী প্রত্যেক রমণীর আদরের ও গৌরবের ধন। ইহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের। আমাদের পূজনীয় গুরুজনগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, আমরা এবং আমাদের কন্যা ভগিনীগণ ভবিষ্যতে ইহার প্রতি সমাদর করিয়া চির উন্নতি সাধনে তৎপর হই। বামাবোধিনী অকালের অসময়ের বামাবন্ধু; ইহার সহিত আধুনিক কোন পত্রিকার তুলনা হইতে পারে না। অবশ্য সহায়-সম্পদে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে বটে। এই সাহিত্যের নবীন যুগে এক্ষণে চতুর্দ্দিক্ শত সহস্র তারকায় প্রদীপ্ত হইয়াছে বলিয়া যেন আমাদের ধ্রুবতারাকে আমরা বিমলিন হইবার অবসর না দি।

বিনীতা সেবিকা মনোজবা-রচয়িত্রী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারতে শিক্ষার উন্নতি—গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের শিক্ষার অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে। ১৯০৮-১৯০৯ সালে ভারতীয় স্কুলসমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৯৮৪১১০ উনষাট লক্ষ চৌরাশি হাজার এক শত দশ জন ছিল; দশ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ইহাপেক্ষা ১৫২০৩৭৫ পনের লক্ষ কুড়ি হাজার তিন শত পঁচাত্তর জন কম ছিল; ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৩৪ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রীর সংখ্যা, ৪২৫৯১৪ চারি লক্ষ পঁচিশ হাজার নয়শত চৌদ্দ জন ছিল। ছাত্রের সংখ্যা ৪০৩৭৮২১ চল্লিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার আট শত একুশ ছিল। ১৯০৮-১৯০৯ সালে ছাত্রের সংখ্যা ৫২০০০৩৫ বাহান্ন লক্ষ পঁইত্রিশ ও ছাত্রীর সংখ্যা ৭৮৪০৭৫ সাত লক্ষ চৌরাশি হাজার পঁচাত্তর জন হইয়াছে। ইহার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ও উন্নতি হইলে আরও সুফল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রমজীবী গ্রাডুয়েট—ইংলণ্ডে সম্প্রতি

একজন বালিকা পরিচারিকা ও দুইজন শ্রমজীবী বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের একজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্ব্বে বালক দুই জনকেই কুলির কার্য্য করিতে হইত।

জার্ম্মণীর রাজকুমার—জার্ম্মণীর রাজ-কুমার ভারতবর্ষে আসিয়া নবেম্বর ও ডিসেম্বর দুইমাস ভারতবর্ষে থাকিয়া এখানকার সকল স্থান দর্শন করিবেন।

দুইলক্ষ টাকা দান—নিরাশ্রয় বিপন্ন মুসলমানবালিকাগণের সাহায্যের নিমিত্ত বোম্বাইয়ের পুলীশ কমিশনর অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। তাহাতে অবস্থাবিশেষে বিপন্ন বালিকাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন ও আশ্রয়দানের উপায় করা হইবে। ইহার জন্য ৮০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সওদাগর আবদুল্লা হাজি দাউদ এই ফণ্ডে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

মৃত্যু—২রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণনগরের মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি অতি সদাশয় ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। ইহাঁর বিয়োগে সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যথিত হইয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষা ও তাহার উন্নতিকল্পে মহারাজ অনেক টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক অসহায় দরিদ্র ইহাঁর নিকট হইতে অনেক সাহায্য লাভ করিত। মহারাজ কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা মনে করিতেন, শত বিঘ্ন বাধা উপেক্ষা করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতেন। এই সদাশয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাত্মার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একটী রত্ন হারাইল।

রামচন্দ্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কিন্তু ভগবানের পরীক্ষা ইহাতেই পর্য্যাপ্ত নহে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—রামের অদৃষ্টে সুখশান্তি বড় বেশী নাই। যখন পঞ্চবটীতে তাঁহারা শান্তভাবে দিন যাপন করিতেছিলেন তখনই রাম-সীতার সুখসৌভাগ্য প্রায় চিরদিনের মত বিনষ্ট হইবার জন্য এক অসম্ভাবিত বিপদের আয়োজন হইল। সুদূর সমুদ্র-পারবর্ত্তী লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণের বিধবা ভগ্নী শূর্পণখা অভিভাবক ও অনুচরদিগের সহিত সেই বনে অবস্থিতি করিতেছিল। রাম-লক্ষ্মণের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সে বিবাহপ্রার্থিনী হইল। রাক্ষসীর অসদৃশ কামনায় রাম ও লক্ষ্মণ রহস্য করিতে গিয়া বিপদের সৃষ্টি করিলেন। কেননা লক্ষ্মণকে ব্রহ্মচারী জানিয়া, রাক্ষসী রামের পাণিপ্রার্থিনী হইল এবং রামকে পত্নীসংযুত দেখিয়া, সেই

বিঘ্ন দূর করিবার জন্য জানকীর জীবন সংহারের চেষ্টা করিতে লাগিল। সুতরাং সীতাদেবীকে বিপন্মুক্তা করিতে, (স্ত্রীবধ না করিয়া) লক্ষ্মণ তাঁহার খড়্গাঘাতে শূর্পণখার কর্ণ-নাসিকা ছেদন করিলেন। অপমানে এবং মনোরথব্যর্থতায় রাক্ষসী অনার্য্য-জনোচিত জিঘাংসার বশীভূতা হইয়া মূর্ত্তিমতী অগ্নিশিখার ন্যায় অগ্রজ রাবণের নিকটে উপস্থিত হইল এবং যথাসাধ্য আত্মদোষ গোপন করিয়া, রাম-লক্ষ্মণকে দোষী বলিয়া এ অপমানের প্রতীকার প্রার্থনা করিল। রামের পরম রূপবতী পত্নীকে হরণ করিয়া আনিলে রাম-লক্ষ্মণের দর্প চূর্ণ হইবে এবং রাবণের পরম সুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভ হইবে, ইহা বুঝাইল।

অনুজার কথা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী, বীর, মদমত্ত, অদম্য-উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র রাবণ তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যের আয়োজন করিল। নানারূপ ছলনা করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বাসস্থান হইতে অপসারিত করিয়া, সন্ন্যাসিবেশে সীতার সরল মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া, রামের সেই প্রাণসমা পতি-প্রাণা সাধ্বী জায়াকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। পথে রামের পিতৃবন্ধু জটায়ু রাবণকে বাধা দিতে যুদ্ধ করেন, তাঁহাকে মুমূর্ষু দশায় পাতিত করিয়া রাবণ লঙ্কায় গমন করিল। পতিব্রতা সীতাদেবীর আর্ত্তনাদ, অনুনয়, অভিশাপ, কিছুতেই তাহার পাপ সঙ্কল্প বিচলিত হইল না।

রাবণের শত সহস্র প্রলোভনেও সতী যখন তাহার আয়ত্ত হইলেন না, তখন সে অশোকবনে বহু কিঙ্করীতে বেষ্টিত করিয়া সীতাকে রাখিয়া দিল। এই সকল কিঙ্করী প্রতিদিন প্রথমতঃ জানকীকে রাবণের বশীভূতা হইতে উপদেশ দিত, তাহাতে সীতা অসম্মতা হইতেন বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিত। পতিব্রতা সীতা পতিধ্যানেই দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাম-লক্ষ্মণ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া, শূন্যকুটীর দর্শনে যেমন বিস্মিত, তেমন আকুল হইয়া পড়িলেন। দুজনে প্রাণপণে খুঁজিয়াও জানকীর কোন সন্ধান পাইলেন না। যিনি রামের প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়তমা, যাঁহার সাহচর্য্যে ভীষণ অরণ্যও রামের নিকটে রাজভবন তুল্য আরামপ্রদ ছিল, আজি তাঁহার এই অচিন্তিতপূর্ব্ব অন্তর্দ্ধানে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রামের চিরদিনের অভ্যস্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা যেন তিনি হারাইয়া ফেলিলেন। রাম বালকের মত, উন্মত্তের মত দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। রামের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে রামগতপ্রাণ লক্ষ্মণ জীবন্তে মৃত্যুযন্ত্রণা সহিতে লাগিলেন।

অনেক অনুসন্ধানের পরে তাঁহারা মৃতপ্রায় জটায়ুর সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহার মুখে রাবণের কাহিনী অবগত হইলেন। সকল কথা বলিয়া জটায়ু

প্রাণহীন হইলেন। তখন রাম বিলাপ পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মণের সহায়তায় জটায়ুর যথাবিধি অগ্নিসংকার সম্পাদন-পূর্ব্বক সীতার উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

তাঁহারা শাপগ্রস্ত দস্যু কবন্ধের নিকটে সুগ্রীবের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন শোকাকুল রাম, চিরসুহৃৎ লক্ষ্মণের সহিত পম্পাতীরে সুগ্রীবের অনুসন্ধানার্থ গমন করিলেন। তখন রামের মনের অবস্থা অতি ভয়ানক, ক্ষিপ্ততুল্য।

রাবণ যখন সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সুগ্রীবাদি পঞ্চ বানরকে উপবিষ্ট দেখিয়া সীতা রাম-লক্ষ্মণের নামোল্লেখপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে তাঁহার ভূষণ সকল ফেলিয়া দেন এবং রাম-লক্ষ্মণকে সেই ভূষণ প্রদান করিতে অনুনয় করেন। সুগ্রীব তাহা সংগ্রহ করিয়া রাম-লক্ষ্মণের অনুসন্ধান করিবার জন্য, কৃতী, কার্য্যকুশল, বিশ্বস্ত সহচর হনুমানকে পম্পাতীরে প্রেরণ করেন। সেখানে রাম-লক্ষ্মণের সহিত হনুমানের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

রামলক্ষ্মণের তেজোময় অথচ সৌম্য মূর্ত্তি, কান্ত রূপ দেখিয়া হনুমান্ চমৎকৃত হইলেন। তিনি সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,—"আপনারা পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পন্ন, আপনারা এরূপ চীরবল্কল ধারণ করিয়াছেন কেন?" লক্ষ্মণ হনুমানের সমস্ত পরিচয় পাইয়া আপনাদের পরিচয় দিলেন; তাহার পরে বলিতে লাগিলেন,—"দনুর নির্দ্দেশে আজি আমরা সুগ্রীবের শরণাগত হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, সেই জগৎপূজ্য রাম আজি বানরাধিপতির শরণ লইবার জন্য এখানে উপস্থিত। ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্ত্তি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার গুরু রামচন্দ্র স্বয়ং বানরাধিপতির শরণ লইতে এখানে আসিয়াছেন। সর্ব্বলোকে যাঁহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয় ভিক্ষা করিতে সুগ্রীবের নিকটে উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত্ত; সুগ্রীব অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান করিবেন।" না জানি কত অশ্রু ঝরাইয়া লক্ষ্মণ রামচরিত্রের এই পরিচয় দিয়াছিলেন!

বানররাজ সুগ্রীব ভ্রাতৃবিবাদে রাজ্যভ্রষ্ট ও গৃহচ্যুত হইয়া ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পত্নীহারা দীন রামচন্দ্র তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া করুণার্দ্র হইলেন। উভয়ে বন্ধুতা করিলেন; উভয়ে উভয়ের শত্রু বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাম প্রীতির উচ্ছ্বাসভরে, অনুরক্ত ভক্ত চণ্ডালরাজ গুহককে প্রেমালিঙ্গন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, বানররাজ সুগ্রীবকেও সাদরে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন।

এই সুগ্রীবকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার

ও স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষা করিবার নিমিত্ত রামচন্দ্র কিস্কিন্ধ্যাপতি, সুগ্রীবের অগ্রজ বালীকে নিহত করেন। বালী মৃত্যুকালে রামচন্দ্রকে যে তীব্র ভর্ৎসনা করেন, তাহা, এবং মহিষী তারা ও কুমার অঙ্গদের সকরুণ বিলাপ শ্রবণ করিলে, বালীবধ রামচরিত্রে একটী কলঙ্ক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু রাম ক্ষত্রিয় বীর, বিশেষতঃ সুগ্রীবের কাছে তিনি বালী-বিনাশে অঙ্গীকৃত, কাজে কাজেই রামের পক্ষে বালীবধ এক "কর্ত্তব্য" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল (১)। যাহাই হউক, বালীবধে রামচন্দ্র আত্মপ্রসাদ লাভ করেন নাই। রাম যেরূপ সন্তপ্ত, যেরূপ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, বালীবধ যদি বাস্তবিক কোন অন্যায় কাজ হইয়া থাকে, তবে সেরূপ অনুতপ্ত ব্যক্তিকে অতিবড় শত্রুতেও ক্ষমা করিতে পারে।

রামচরিত্রের ধীরতা ও কমনীয়তা আর এক স্থলেও উজ্জ্বল হইতেছে। বালীবিনাশের পরে সুগ্রীব কিস্কিন্ধ্যা-রাজা, মহিষী তারা এবং বালীর সর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হইলেন। সীতা-শোকে জীবন্মৃত রাম-লক্ষ্মণের সহিত কত ক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। বর্ষার শেষে নদ নদী ক্ষীণ হইলে বানরসৈন্য কর্ত্তৃক সীতার অনুসন্ধান হইবে। রাম সজলনেত্রে এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিলেন।

যথাকালে শরৎকাল আসিল। কিন্তু রাজ্যসুখপ্রমত্ত সুগ্রীব, মহোপকারী সুহৃদ্ রামচন্দ্রকে স্মরণ করিলেন না। এ কৃতঘ্নতায় রাম বড়ই কুপিত হইলেন; লক্ষ্মণ তদধিক কুপিত হইলেন। কেবল যে সুগ্রীব রামের হৃদয় বুঝিলেন না বলিয়া তাঁহারা কুপিত, তাহা নহে, এতাদৃশ অন্যায়কারীর উপরে ন্যায়বানের যে ক্রোধ, ইহা তাহাই।

রাম সুগ্রীবকে উদ্বোধিত করিবার জন্য লক্ষ্মণকে পাঠাইলেন; বলিলেন, "যে পথে বালী গিয়াছেন, সে পথ সঙ্কুচিত হয় নাই; সুগ্রীব! যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠ হও, বালীর পথ অনুসরণ করিও না।" ক্রোধের আবেগে এই কথা বলিয়া আবার সংযমী, সুশীল রঘুবর অনুজকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন,—প্রীতির অনুসরণ ও পূর্ব্ব বন্ধুতা স্মরণ করিয়া, রুক্ষভাব পরিহারপূর্ব্বক, হিত বাক্যে সুগ্রীবের সহিত কথা বলিও।" সময় ও পাত্র বিবেচনা করিলে রামচরিত্রের এই সংযতি এই সুশীলতা বড়ই মনোহর বোধ হয়।

হনুমান অসাধ্য সাধন করিয়া সীতার সাক্ষাৎ পাইলেন। বানরবাহিনীর সহায়তায় সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া রাম-

(১) অনেকে বালিবধ জন্য রামচরিত্রে দোষারোপ করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে মূল রামায়ণের তাৎপর্য্য জ্ঞাত নহেন। এ বিষয়টী দুই এক কথায় বুঝাইবার নহে। এজন্য বারান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহা বুঝাইব। বাঃ—সঃ।

লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। পত্নীহরণকারী আততায়ী রাবণের প্রতিও রাম শিষ্টাচারশূন্য নহেন। প্রথমতঃ রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া, দূতমুখে তাঁহাকে জানকীকে প্রত্যর্পণ করিতে বলেন এবং রামের কথামত জানকীকে প্রত্যর্পণ করিলে তিনি যুদ্ধ না করিয়াই স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন, তাহাও বিজ্ঞাপিত করেন। কিন্তু ধনমদমত্ত বীর্য্যমদমত্ত রাক্ষসরাজ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রিগণ সদুপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলে রাবণ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। বিভীষণকে নিগ্রহপূর্ব্বক দূর করিয়া দিলেন। ক্রোধে অপমানে বিভীষণ রামের শরণাপন্ন হইলে, ভ্রাতা, বন্ধু ও অনুচরদিগের আপত্তি খণ্ডন করিয়া রাম বন্ধুভাবে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

রাম নিজ প্রাণাধিক অনুজ লক্ষ্মণের সহায়তায়, হনুমান্—অনুরক্ত ভক্ত হনুমানের দক্ষতায়, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বুবান্ ও বানরবাহিনীর সাহচর্য্যে, বিভীষণের মন্ত্রণায় এবং নিজ বাহুবলে লঙ্কার সম্রাট্ প্রবলপ্রতাপান্বিত, বহু ধনজনের অধীশ্বর রাবণের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন। সেই রাক্ষসরাজের অগণ্য সেনা ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হইতে থাকে। সমস্ত সেনা ও সেনানায়ক প্রায় নিহত হইলে রাবণের প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ লক্ষ্মণহস্তে নিহত হন। শোকাভিভূত রাবণ রোষপরবশ হইয়া লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে পাতিত করেন।

যিনি রামের প্রাণাধিক স্নেহের ধন, যিনি রামগতপ্রাণ, রামময়জীবিত, যিনি রামের নিত্যসহচর, তাঁহার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া রাম—সেই অপরিসীম ধৈর্য্যশীল রাম শোকে আত্মহারা হইলেন। যে দিন সীতা অপহৃত হন, সে দিন রাম যেরূপ আকুল হইয়াছিলেন, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িলে তদধিক আকুল হইয়াছিলেন।

রাম যখন ভূপতিত লক্ষ্মণের দেহ রক্ষা করিতেছিলেন, রাবণ তখন সুযোগ বুঝিয়া রামের পৃষ্ঠ শরযোগে ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল। কিন্তু সেদিকে রামের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। যখন প্রাণপ্রিয় অনুজ-দেহ রক্ষা করিবার ভার বিশ্বস্ত, সমর্থ অনুচরের হস্তে দিতে পারিলেন, তখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আত্ম রক্ষা এবং রক্ষোরাজকে রণ ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিলেন।

সংগ্রামের অবসর পাইয়া রাম সেই শবাকার লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি যেরূপ আমাকে বনে অনুগমন করিয়াছিলে, আজি আমিও সেইরূপ তোমাকে যমালয়ে অনুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না। সীতার মত স্ত্রী অনেক খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়া যাইবে না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধুজন পাওয়া যায়, কিন্তু এমন দেশ দেখি নাই যেখানে

তোমা হেন ভাই পাওয়া যাইবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন করিয়া একবার আমাকে দেখ, আমি পর্ব্বতে বা বনমধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ণ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমাকে সান্ত্বনা দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ?"

ভগবৎ-কৃপায় লক্ষ্মণ পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার নয়নের মণি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

রঘুপতির অনন্যসাধারণ পুরুষকার-প্রভাবে অসম্ভব ঘটনা সম্ভাবিত হইল। সেই দিগ্বিজয়ী বীর দশানন যুদ্ধে সবংশে নিহত হইল। রামের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল।

রামচন্দ্র অশোক বন হইতে সেই পতি-প্রাণা, সাধ্বী, ম্রিয়মাণা, সীতাকে নিজের নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু রাম জানিতেন, যে,দশ মাস সীতা রাবণের গৃহে বাস করিয়াছেন, ইহাতে সাধারণের মন সীতার প্রতি সংশয়ারূঢ় হওয়া সম্ভব। সে পুণ্যবতী, যদি সর্ব্বজন-নয়ন-সমক্ষে বিরাজমানা হন, সর্ব্বসাধারণে যদি সে পবিত্রতার প্রতিরূপস্বরূপা মূর্ত্তি নয়ন-গোচর করিতে পারে, তবে তাহারাও মিথ্যা সন্দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে।

সেই জন্য রাম, সীতাকে সেই অগণ্য কপিরাক্ষসমণ্ডলীর মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে তাঁহার নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন। লজ্জা ও সঙ্কোচে মৃতকল্পা জ্যোতির্ম্ময়ী সীতার প্রতি পাদ-ক্ষেপে তাঁহার পবিত্রতা যেন উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সেই লোকমণ্ডলীর অনেকে সেই পুণ্যবতী দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া সসম্ভ্রমে নতশির হইলেন। দিগ্দিগন্ত সেই শান্ত-পাবন অচিন্ত্যবৈভব তেজশ্ছটায় উদ্ভাসিত হইল।

চন্দন ঘর্ষিত হইলেই তাহার সুগন্ধ প্রকাশিত হয়; সাধু বা সাধ্বী মহাসঙ্কটে পরীক্ষিত হইলেই তাঁহাদের বিশুদ্ধ চরিত্রের যশোরাশি সাধারণের শ্রুতিগোচর হয়। সেই জন্য রামচন্দ্র সীতার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি বহুদিন রাক্ষসগৃহে একাকিনী অবস্থান করিয়াছ, অতএব তোমাকে আর আমি গ্রহণ করিতে পারি না। কুলের কলঙ্কক্ষালনার্থে তোমার উদ্ধার সাধন করিলাম; এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা কর, সেইখানে থাকিতে পার।"

রামের এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া সেই বিপুল সৈন্যসংঘ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল; লক্ষ্মণ মরমে মরিয়া গেলেন; আর সীতা?—পতিব্রতা সাধ্বীর নিষ্পাপ মুখমণ্ডল লজ্জা ও অভিমানে রক্তচন্দন-রঞ্জিত কমলের ন্যায় রক্তিম হইল। তিনি প্রাণ পরিত্যাগ সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া লক্ষ্মণ চিতা সজ্জিত করিলেন। তখন রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, নিজ সতীত্বের অক্ষুণ্ণতা বিষয়ে অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া পতিপ্রাণা জানকী সেই প্রজ্বলিত চিতা-নলে আত্মসমর্পণ করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন, সেই

অনন্তবিস্তৃত সমুদ্রকূলে, রাম ও লক্ষ্মণ, সুগ্রীবের বানরকটক, বিভীষণের রাক্ষস-কটক, দেবলোক, পিতৃলোক সকলেই দেখিলেন, ধীরে ধীরে চিতানল নির্ব্বাপিত হইলে সেই সতীত্বময়ী লক্ষ্মী সীতাদেবী অক্ষতশরীরে অগ্নি হইতে উত্থিতা হইলেন। হুতাশন তাঁহার বসনাগ্র বা কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। সতীর মহিমা দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইলেন; সীতার জয়গীতি দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন রামচন্দ্র প্রিয়তমা ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস পূর্ণ হইলে অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত রামচন্দ্র অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। ভরত, শত্রুঘ্ন, মাতৃগণ, পৌরজনবর্গ এবং প্রজামণ্ডলী সকলেই তাঁহাদিগকে পাইয়া মৃত শরীরে জীবন-প্রাপ্তিরূপ আনন্দ লাভ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত ঘটনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ব্রাহ্মণ তথায় বহুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান। অনন্তর দৃষ্ট হইল,—যেন অসংখ্য আলোকমালা শনৈঃ শনৈঃ সেই দিকে আসিতেছে। ক্রমে উহা সন্নিহিত হইলে,দৃষ্ট হইল,—একখান প্রকাণ্ড পাল্কি আসিতেছে, কতকগুলা বিকটাকার পুরুষ তাহা বহন করিয়া আনিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক ভীষণ-মূর্ত্তি মসালহস্তে আসিতেছে। সকলেই নীরব, সাড়াশব্দ নাই। ক্রমে সেই পাল্কি ও সেই বিকটমূর্ত্তিগুলা যখন পুষ্করিণী-তটে উঠিল, তখন তাহাদের আকার-প্রকার ও বেশভূষাদি সুস্পষ্ট ব্রাহ্মণের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহা এরূপ ভীষণ, এরূপ লোমহর্ষণ যে, তদ্দর্শনে অসমসাহসিক বীরকেশরীরও সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ অচল পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। তাঁহার সে অবস্থা তখন ভয়-বিস্ময়ের অতীত। পাল্কি ঠিক্ তাঁহার সম্মুখে আসিলে, তদারূঢ় সেই বিকট-মূর্ত্তির সঙ্কেতে, বাহকেরা তথায় দণ্ডায়মান রহিল। তখন মনে মনে প্রাণ ভরিয়া সঙ্কটহারিণীর নাম গ্রহণপূর্ব্বক, ব্রাহ্মণ গোপালের সেই পত্রখানি পাল্কির মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিকটমূর্ত্তিও পত্রখানি লইয়া, জলন্ত অগ্নিগোলকের ন্যায় প্রকাণ্ড চক্ষুর্দ্বয় সেই পত্রে সন্নিবিষ্ট করিল। অনন্তর হস্তসঙ্কেতে ব্রাহ্মণকে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া, কতিপয় অনুচরকে, মানবের অজ্ঞাত ভাষায়, কি

আদেশ করিল। তৎক্ষণাৎ কতিপয় অনুচর বায়ুবেগে প্রস্থান করিল। বহুক্ষণ পরে তাহারা প্রত্যাগমন করিয়া, সেই যানারূঢ় প্রভুকে সাঙ্কেতিক ভাষায় সংবাদ জানাইল।

তখন সেই পুরুষ, ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত সেই পত্রের উপর লৌহশলাকা দিয়া কয়েকটী সাঙ্কেতিক অক্ষর লিখিয়া, তাহা ব্রাহ্মণের দিকে নিক্ষেপ করিল। ব্রাহ্মণ থরথর কাঁপিতে কাঁপিতে সেই পত্র গ্রহণ করিলেন। পশ্চাৎ,—দেখিলেন, তথায় জনপ্রাণী নাই। সেই নিস্তব্ধ! গভীর নিশীথে তিনি একাকী অবস্থিত। পলকের মধ্যেই যেন একটী মায়াময় ইন্দ্রজাল সহসা, প্রাদুর্ভূত ও তিরোহিত হইল। তাদৃশ অমানুষ ঘটনায় মহাবীরেরও চেতনা বিলুপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ তথায় বহুক্ষণ বিচেতন ও মৃতকল্প হইয়া পতিত ছিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ সংজ্ঞা লাভ করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ গোপালের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ গৃহে আসিয়াই থর-থর কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ আর বাক্‌শক্তি রহিল না। গোপাল ও তাঁহার মাতা ব্যগ্রভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উভয়ে বহুক্ষণ শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রমুখাৎ সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া, এবং সেই বিকটমূর্ত্তি প্রদত্ত সাঙ্কেতিক পত্র পাঠ করিয়া, গোপাল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—ঠাকুর! কার্য্যসিদ্ধি হইবে। আপনাকে এ স্থানে শনিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিবেন না, করিলেও কোনও উত্তর পাইবেন না। ব্রাহ্মণ এ কয়দিনেই মৃতকল্প, তদুপরি যে দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এককালে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত। তিনি উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতেছিলেন। শেষে গোপালের ভয়প্রদর্শনে নিরস্ত হইয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু নিদ্রা হইল না। সেই ঘোর বিভীষিকা-ময় ভৌতিক দৃশ্য ভাবিতে ভাবিতে অতিকষ্টে সে রাত্রি যাপন করিলেন।

এইরূপ কঠোর দুশ্চিন্তায়, অনিদ্রায় ও হাহাকারে ক্রমে তিন দিন কাটিল। রোগার্ত্ত, শোকার্ত্ত, কারারুদ্ধ, দীনহীন অন্ধ-আতুর গলিতকুষ্ঠী, সকলেরি দিন কাটে। তবে, প্রাক্তন কর্ম্মফলে, দিন কাহারও সুখে, কাহারো বা দুঃখে কাটে। যমালয়-তুল্য কারাগৃহে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ চরণে পতিত থাকিয়াও, যমকিঙ্কর তুল্য কারা-রক্ষকের নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও, সে ব্যক্তি সুখী, যে ভাগ্যবান্ অপাপবিদ্ধ, কল্যাণময়, চারিত্রজন্য অনির্ব্বচনীয় আত্ম-প্রসাদ সম্ভোগ করেন। যিনি ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরকালের নিকট অম্লান হৃদয়ে—অকুতোভয়ে বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইতে পারেন, সেই চারিত্রবীর এ ঘোর সংসার-কারায় থাকিয়াও, শান্তিময় স্বর্গরাজ্যের মহামহিম সম্রাট্। সেই চারিত্রবীর, নিরর্গল-

গগন-বিহারী বিহঙ্গের ন্যায় মুক্তপুরুষ। তিনি ভব-পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের শিক্ষিত, কৃত্রিম বুলি পরিত্যাগ করিয়া, স্বহৃদয়ের অনাহতচক্রোত্থিত "ওঁ"—নাদে সেই প্রাণপুরুষ প্রাণব্রহ্মকে চমকিত করেন।

ক্রমে সেই মৃতকল্প ব্রাহ্মণের গভীর শোকোচ্ছ্বাস সহ কয়দিন অতিবাহিত হইল। আজি শনিবার। রাত্রি প্রভাত। তখনও ব্রাহ্মণ শয্যাত্যাগ করেন নাই। নয়নজলে উপাধান ও শয্যাতল সিক্ত করিয়া, সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়াই কাটাইয়াছেন। উষাকালে নিদ্রিত হইয়াছেন। গোপাল প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, কর্ম্মস্থানে যাইবার সময় মাকে বলিলেন,—মা! ব্রাহ্মণকে জাগাইবেন না। বোধ করি, সারারাত্রি জাগরণ করিয়া এক্ষণে নিদ্রিত হইয়াছেন। উনি উঠিলে, উঁহার যথাবিধি সেবার কোনও ত্রুটি না হয়। আমি সন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিব। উঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিবেন। আপনার আশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র সম্বল। প্রাণ ভরিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ শরণাগত, শোকবিহ্বল ব্রাহ্মণের বিপদুদ্ধার হয়। মা জিজ্ঞাসিলেন,—বাবা! ব্রাহ্মণের এ বিপদ্ কাটিবে ত? দেখো বাবা! এ বিপদ্ না কাটিলে, নিজ বাটীতেই আমাদিগকে ব্রহ্মহত্যা দর্শন করিতে হইবে। তদপেক্ষা আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়। গোপাল বলিলেন,—মা! আমার প্রতি আপনার আশীর্ব্বাদ বিফল হইবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইহা বলিয়া গোপাল প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় তিনি গৃহে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন,—বাবা! আজি অনেক কষ্টে বিস্তর প্রবোধ দিয়া ব্রাহ্মণকে যৎসামান্য আহার করাইয়াছি। অনন্তর গোপাল নিজ পূজার স্থানে গিয়া দ্বাররোধ পূর্ব্বক বহুক্ষণ অবস্থান করিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া, সাহস প্রদান-পূর্ব্বক, তাঁহার উত্তরীয়-প্রান্তে পূর্ব্ববৎ ভূর্জ্জপত্র বন্ধন করিলেন, এবং বলিলেন,—আপনি সেদিনের ন্যায় ঠিক্ সেই সময়ে সেই স্থানে গিয়া, সেই ভাবে প্রতীক্ষা করুন। একবার যাহা দেখিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহা দেখিলে, বোধ হয়, আর তত ভয় হইবে না। তবে এ কথা স্মরণ রাখিবেন,—ভয় পাইলেই সর্ব্বনাশ! তৎক্ষণাৎ আপনার মৃত্যু ঘটিতে পারে। এজন্য ভূয়োভূয়ঃ আপনাকে সতর্ক করিলাম।

ব্রাহ্মণ তখন জীবনে বা মরণে উদাসীন। "আজিকার এ শেষ চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তবে আমার আত্মহত্যাই অবধারিত। কোন্ মুখে আর গৃহে ফিরিব? আত্মীয়স্বজনকে গিয়া কি বলিব? দীর্ঘ প্রবাস হইতে প্রত্যাগত, আশান্বিত, প্রাণাধিক পুত্রকেই বা কি বলিয়া প্রবোধ দিব? লোকসমাজেই বা কি করিয়া মুখ দেখাইব? হা বিধাতঃ!

তোমার চরণে এ হতভাগ্য সন্তান কি দোষ করিয়াছে? দয়াময়! দয়াময়! দয়া কর! দয়া কর!" মনে মনে এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে ও অভয়া মার পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে ব্রাহ্মণ একাকী সেই তমসাচ্ছন্ন ঘোর নিশীথে সেই ভয়াবহ স্থানে চলিয়াছেন। এবার একেবারেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন। নৈশান্ধকার তাঁহার চক্ষে আরও ঘনীভূত বোধ হইল।

(ক্রমশঃ)

পুণ্যজীবনের প্রচ্ছন্ন চিত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্যদেব কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, ফরিদপুরস্থ সকলকে লইয়া আমাদের বাটীতে যেরূপ জীবন্তভাবে ঈশ্বর-দর্শন বিষয়ে উপদেশ ও বক্তৃতাদি প্রদান করিতেন, তাহা শ্রবণে প্রাচীন মহিলাগণের হৃদয়েও অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। "জাতনেশে কেশব সেনকে লইয়া আহার করিয়া তুই উচ্চবংশ, মর্যাদা বিসর্জ্জন দিলি" বলিয়া প্রথমে পিতামহীদেবী আকুল ক্রন্দনধ্বনিতে গৃহ পূর্ণ করিয়া পিতৃদেবকে অনবরত ভংর্সনা করিতেন। মাঝে মাঝে আত্মহত্যারও ভয় প্রদর্শন করিতেন। পিতৃদেব হিমাচলের ন্যায় স্থির গম্ভীরভাবে এক মুহূর্ত্তের জন্যও জননীর ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের অনবরত গঞ্জনায় কোন প্রকারেই চিত্তের স্থিরতাহারা হন নাই। প্রত্যুত শ্রদ্ধেয় আচার্য্যদেবের অগ্নিময় উপদেশের মর্ম্ম যাহাতে সকল শ্রেণীর পুরুষ,মহিলা,বালক, বালিকা গ্রহণপূর্ব্বক উপকৃত হইতে পারেন, পিতৃদেব ও পরম শ্রদ্ধেয় মৈত্র মহাশয় একাগ্রচিত্তে তাহারই ব্যবস্থা করাতে অতি সুফল উৎপন্ন হইয়াছিল। বহির্বাটীতে সাধারণ লোকদের জন্য যে প্রাণস্পর্শী উপাসনা হইত, সহরের মহিলাগণকেও নিমন্ত্রণপূর্ব্বক পিতৃদেব সেই ব্রহ্মরসামৃতপানের অধিকারী করিয়াছিলেন। মহিলাগণ আচার্য্যদেবের অমূল্য উপদেশ ও গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তিপ্লুত সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে বিগলিত চিত্তে বাহিরে গমনপূর্ব্বক আচার্য্যদেব ও তাঁহার শিষ্যবর্গের পদধূলি গ্রহণেও উদ্যত হইতেন। আমরা বালক বালিকাগণ সর্ব্বত্র ছায়ার ন্যায় আচার্যদেবের অনুসরণ করিতাম। কোনক্রমে তাঁহার দৃষ্টিতে পতিত হইলে পরম সৌভাগ্য মনে করিতাম। আচার্য্যদেবের সহিত পিতৃদেব আন্তরিক বন্ধুতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন। আহারের সময়ে তাঁহাদের যে

রসিকতাপূর্ণ আলাপপ্রবাহ চলিত, এখনও যেন তাহা শ্রবণে বাজিতেছে। আচার্য্যদেবের ফরিদপুরত্যাগের সময়ে বিচ্ছেদের অশ্রু,ভক্তমণ্ডলীর লোচন প্লাবিত ও হৃদয় শূন্য করিয়াছিল। পিতৃদেব এবং মাতৃদেবীকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া আমরাও ভাই ভগ্নী-মিলিত হইয়া যথেষ্ট কাঁদিলাম। ঐ বৎসর হঠাৎ ফরিদপুর-সহরে বিষম ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সহরটী মৃত্যুর হাহাকারে পূর্ণ হইল। আমাদের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন ভৃত্যাদি সকলেই একত্র ম্যালেরিয়াতে শয্যাশায়ী। আমার দুইটী কনিষ্ঠা ভগ্নী প্রায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়ার উপক্রম হইল। মাতুল, মাতুলানী, দিদিমা প্রভৃতিও ঐ দশাগ্রস্ত। সৌভাগ্যক্রমে পিতৃদেব ও আমি ঐ বিষম বিপদ্‌কালে জ্বরাক্রান্ত হই নাই। আমি তখন গৃহকার্য্যে অত্যন্ত অপটু, বালিকা মাত্র। তথাপিও বাড়ীর ভৃত্যবর্গ হইতে মাতুল, মাতুলানী, দিদিমা, ভগ্নীগণের পথ্যাদি ও ঔষধ পিতৃদেবের আদেশমতে নিয়মিতরূপে প্রস্তুত করিতাম; কেবল তাহাই নহে, এই কার্য্যে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতাম। খেলাধূলা ভুলিয়া ঐ অসময়ে কিরূপে সকলের উপকারে আসিতে পারি এইজন্য ঈশ্বরচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা হৃদয়ে জাগিত; এবং সেই বালিকাবয়সেই প্রার্থনার বল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। গ্রীষ্মের ছুটীতে বসু মহাশয় জয়সিদ্ধি যাইবার পথে ফরিদপুরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তথাকার ভীষণ ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া পিতৃদেবকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে কর্ম্মস্থল পরিবর্ত্তন জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। ঐ সময়ে আমাদের ফরিদপুরের বাড়ী একটী হস্পিটালে পরিণত হইয়াছিল। পিতৃদেব ৩।৪ জন ডাক্তারকে গৃহে রাখিয়া নিশিদিন সহরের সকলের বাটীতে ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণ করিতেন। একএক বাড়ী প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। কয়টী শিশু ও বিধবা মাতা যমগ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এমন দুর্দ্দশায় পতিতা,গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও উপায়হীনাদের সাহায্যের জন্য বেলা দুই প্রহরে আমি গমনপূর্ব্বক সামান্য পথ্যাদি প্রস্তুত ও ঘরের কাজ যতটা পারি, করিয়া পিতৃদেবকে বলিতাম। তিনি মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য প্রেরণ দ্বারা অর্থের সমুচিত সার্থকতা করিতেন। ক্রমে আমিও বিষম জ্বরাক্রান্ত হইলাম। ৫।৬ মাস জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পতিত অবস্থায় ফরিদপুরেই চিকিৎসাদি চলিল। অবশেষে এতকালের বন্ধুবান্ধবপূর্ণ ফরিদপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়াতে আমাদের সকলেরই হৃদয়ে বর্ণনাতীত ক্লেশ জন্মিল। আমরা একান্ত পীড়িতাবস্থায় ডিসেম্বর মাসের প্রথমে কলিকাতা পঁহুছিলাম। সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একটী দ্বিতল বাটীতে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বসু মহাশয় তখন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং

কলেজেও প্রফেসার ছিলেন। পরীক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার প্রায়ই জর হইত। পিতৃদেব তাঁহাকে নিকটে রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি কোনমতেই থাকিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে সকলের একান্ত অনুরোধে নিম্নতলস্থ একটী প্রকোষ্ঠে থাকিতে অর্দ্ধসম্মত হইয়া আসিলেন। ঐ প্রকোষ্ঠে দিবসেও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিত না। মশক, মূষিক এবং আরসুলার উপদ্রবে তিষ্ঠান ভার। পিতৃদেবের অনেক অনুরোধেও তিনি উপরের দ্বিতল গৃহে আগমন করেন নাই। দিনরাত্রি একভাবে ঐ কদর্য্য গৃহে মোমবাতি জ্বালাইয়া অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। বসুমহাশয় অতি যোগ্যতা সহকারে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই ইংলণ্ড-যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বৎসর ভাদ্র মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা-দিনে পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীনাথ রায়, কৃষ্ণবিহারী সেন, জগচ্চন্দ্র দাস প্রভৃতি ১১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য লোকের সহিত আমরাও দুইজনে প্রকাশ্যভাবে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করি। ঐ পবিত্র ও স্মরণীয় দিনের সকল ঘটনা এতকালেও হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। দীক্ষার পূর্ব্বে আচার্য্যদেবের গৃহে সর্ব্বদা যাতায়াত ও থিয়োডোর পার্কারের প্রার্থনামালা, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা, কুমুদিনীচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলাম, ও অত্যন্ত সংযম ও নিষ্ঠা সহকারে দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সামাজিক সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে দূরে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। তাহার ফলে শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও দেশের লোকদের ভয়ানক গঞ্জনা অনবরত সহ্য করিতে হইত। বসু মহাশয় ৺মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে ইংলণ্ডে গমনের আয়োজনে প্রতিদিন অপরাহ্নে গমন করিয়া আহারান্তে গভীর রাত্রিতে প্রত্যাগত হইতেন। ততটা সময় গুরুজনদের তিরস্কার আমায় নীরবে সহ্য করিতে হইত। ১২টা ১টার পূর্ব্বে বসু মহাশয় গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। আমায় ততক্ষণ শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আদেশে তাঁহার আহারীয় রক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। বসু মহাশয় ঐ গভীর রাত্রিযোগে সহধর্ম্মীদের লইয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিতেন। আলাপাদির পর একটী খাটে ৬।৭ জন বন্ধুসহ নিদ্রাগত হইতেন। পুত্র এইভাবে গৃহসংস্কারে মাতিয়া উঠিলেন। এখন তাহার ফলে গুরুজনদের নিকট আমার এতই লাঞ্ছনা বৃদ্ধি হইল যে, তাহার ফলে আমি গুরুতর পীড়াক্রান্ত হইলাম। (ক্রমশঃ)

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অন্যান্য বিষয়ে সুবিধা হইলেও টমাস লিন্‌কনের এবং তাঁহার পরিবার-বর্গের স্বাস্থ্য, ইণ্ডিয়ানায়, ভাল থাকিত না। এজন্য ১৮৩০ খৃঃ অঃ টমাস লিন্‌কন্ ইণ্ডিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া ইলিনয় রাজ্যে বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন। ডেনিস্ হাঙ্কস্ এবং এলেন হলও সপরিবারে তাঁহাদের সহিত গমন করিবেন, স্থির হইল। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই, টমাস লিন্‌কন্ ইণ্ডিয়ানার বাসগৃহ বিক্রয় করিয়া, যাবতীয় গৃহসামগ্রী সহ ইলিনয়-রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ কাল পরে তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং জামাতৃগণ সমভিব্যাহারে ম্যাকন (Macon) নামক একটী স্থানে ডেনিস্ হাঙ্কসের খুল্লতাত জন হাঙ্কসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ইণ্ডিয়ানায় আপনাদিগের সংসারে উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া আব্রাহাম্ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে বড় ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা অসঙ্গত বিবেচনায়, তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। জন্ হাঙ্কসের গৃহে অবস্থান-কালে টমাস লিন্‌কন্, ডেনিস ও আব্রাহামের পরামর্শ অনুসারে সাঙ্গমন নদীর উত্তর তীরে স্বীয় বাসগৃহ নির্ম্মাণের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। এখানেও আব্রাহামের উপর গৃহনির্ম্মাণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তিনি উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন, সুতরাং অতি শীঘ্রই বাসগৃহ নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গেল। একখানি মাত্র গৃহে বাস করা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া তিনি তিন-খানি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময় লিন্‌কন্-পরিবারের উপর ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। বাসগৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, টমাস কৃষি-কার্য্যের জন্য একখণ্ড ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কনের ন্যায় পুত্র যে পিতার সহায়, তাঁহার কোনও কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে না। লাঙ্গল-সংযোগে ভূমি কর্ষণ করিয়া আব্রাহাম্ তাহাতে বীজ বপন করিলেন। গবাদির অত্যাচার হইতে শস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি স্বীয় ক্ষেত্র বেষ্টনি দ্বারা ঘিরিয়া লইলেন। বেষ্টনি নির্ম্মাণ-কার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন! ইংরাজীতে একটী কথা প্রচলিত আছে "Necessity is the mother of invention" অর্থাৎ প্রয়োজন উদ্ভাবনের প্রসূতি। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে বাল্যকাল হইতেই সাংসারিক অভাব পূরণের চেষ্টায় নানাপ্রকার কার্য্য শিক্ষা করিতে আদেশ হইয়াছিল। বেষ্টনি নির্ম্মাণ-কার্য্য দ্বারা তিনি সময়ে

সময়ে আপনার পরিবারবর্গের পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করিতেন। আমাদের দেশের ভদ্রশ্রেণীস্থ লোক সকল দরিদ্রতার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা আপন আপন অভাব-মোচনে যত্নবান্ হন না। তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান্ সময় অলস ভাবে অতিবাহিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। পরিশ্রম করিলেই যে তাহার ফল পাওয়া যায়, এ কথায় তাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করেন নাই। বিনা পরিশ্রমে উদরান্নের সংস্থান হইলে তাঁহারা ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ কিন্তু সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। অভাব হইলে নিরাশ হইয়া তিনি পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। কেবল অভাবের সময় কেন, স্বচ্ছল অবস্থাতেও তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। এই সকল কার্য্যকালে বিন্দুমাত্র অবকাশ প্রাপ্ত হইলেই তিনি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতেন। জ্ঞানোপার্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী থাকিলে সহস্র কার্য্যমধ্যেও অবকাশ পাওয়া যায়। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ কার্য্যোপলক্ষে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে পুস্তক পাঠ করিতেন। হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ জাগরূক থাকায় এবং স্বীয় ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথ সুগম করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নানাস্থান হইতে নানারূপ সংবাদ-সংগ্রহে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ থাকিতেন। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সমকক্ষ হইবার আশা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বলবতী থাকিত; এবং সেই আশা যাহাতে পূর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিতেন।

দিবাভাগে পরিশ্রম করিয়া লোকে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং সন্ধ্যার পর তাহারা আর কোনও কার্য্য না করিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে। আব্রাহামের বিশ্রাম কিন্তু অন্যরূপ ছিল। শারীরিক পরিশ্রমের পর তিনি পুস্তক অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়া আপনার হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। সেই সময়ে, একদিন একজন অশ্বারোহী মূল্যবান্ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হন এবং এক-রাত্রির জন্য একটু স্থান প্রার্থনা করেন। আব্রাহামের প্রভু অতিথিকে এবং তাঁহার অশ্বটীকে আহার দান করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ বিশ্রামার্থ কোনও উপায় করিতে পারিবেন না, এ কথা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাঁহার বেতনভোগী যুবকের সহিত একই গৃহে রাত্রি যাপন করিতে পারেন। ভদ্রলোকটী প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। সামান্য ভৃত্যের সহিত একই গৃহে শয়ন করিয়া তিনি আপনার মর্য্যাদার হানি করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু অবশেষে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া যখন তিনি

আব্রাহামের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, যুবক একখানি উন্মুক্ত পুস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন তিনি তাঁহাকে আর সামান্য ভৃত্য জ্ঞান না করিয়া তাঁহারই সহিত একই গৃহে রজনী অতিবাহিত করিলেন। আব্রাহামকে ভাল করিয়া দেখিয়া অতিথি বলিয়াছিলেন যে, যুবক সামান্য লোক নহেন; দেশের কোন মঙ্গলকার্য্য সাধনার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন।

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই টমাস লিন্‌কন্ ইণ্ডিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া ম্যাকন প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক বৎসর কাল অতীত হইতে না হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্থানটী অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। তিনি পুনরায় স্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং পুত্র আব্রাহাম্ লিনকনের সহায়তায় শীঘ্রই কোল প্রদেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাই লিন্‌কন্ পরিবারের শেষ বাসস্থান। এইখানে ১৮৫১ খৃঃ অঃ আব্রাহামের পিতার মৃত্যু হয়।

নিউম্যালেমে ডেন্‌টন্ ওফাট নামক একজন ব্যবসায়ী যুবক অব্রাহাম লিন্‌কনের কার্য্যদক্ষতার কথা অবগত হইয়া তাঁহার সহিত বাণিজ্যার্থ নিউ অরলিন্সে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃঃ অঃ আব্রাহাম্ জনক-জননীর নিকট হইতে অনুমতি লইয়া মিষ্টার ওফাটের সহিত নৌকাযোগে নিউ অরলিন্স অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, আব্রাহাম্ ইহার পূর্ব্বে আর একবার তথায় গমন করিয়াছিলেন। নৌকা তীব্রবেগে গন্তব্য স্থানোদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। পোতমধ্যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, কিন্তু এই আনন্দ শীঘ্রই নিরানন্দে পরিণত হইল। দ্রুতগামী পোত সবেগে এক উচু বাঁধে আটকাইয়া গেল। নৌকার সম্মুখদিক্ বাঁধে লাগিয়া উচু হইলে পশ্চাৎভাগ জলমধ্যে মগ্ন হইল। নৌকাস্থিত সকলেই মহা চিন্তিত হইলেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যাইতে পারে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, মানব বিপদের সময় ধৈর্য্যধারণে অক্ষম হইয়া নূতন বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করে। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিপদের সময় তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যখন অন্যান্য সকলে ভয়ে অভিভূত হইয়া নৌকামধ্যে কালযাপন করিতে লাগিলেন, তিনি তখন স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা বিপদ্ হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া তাহাতে আপনাদিগের সমস্ত জিনিস রক্ষা

করিলেন এবং তাঁহাদের নৌকার যে অংশ বাঁধে আটকাইয়া গিয়াছিল, সেই দিকে একটী ছিদ্র করিলেন। লিন্কনের শরীরে অসাধারণ বল ছিল। তিনি দুই এক জনের সাহায্যে নৌকার পশ্চাৎ দিক্ তুলিয়া ধরিলে, সেই ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নির্গত হইয়া গেল। ছিদ্রটী উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া আব্রাহাম্ নৌকাখানি গভীর জলে ঠেলিয়া দিলেন। নৌকা ভাসমান হইল। ইহা দেখিয়া যাঁহারা তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা আব্রাহামের বুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। লিন্কনের কৌশল-গুণে পোতখানি ভাসমান হইলে মিষ্টার ওফাট আপনার দ্রব্যাদিসহ ধীরে ধীরে নিউ অরলিন্সে উপস্থিত হইলেন। মিষ্টার ওফাট কয়েক দিবস সেখানে অবস্থান করিয়া আব্রাহামের সাহায্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করিবার পর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নিউ অর-লিন্সে অবস্থানকালে লিন্কনের ভাবী জীবনের একটী মহৎ কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। নিউ অরলিন্সে তখন দাসব্যবসায় পূর্ণমাত্রায় চলিত। ঔপনিবেশিকগণ আফ্রিকাদেশীয় নর-নারীদিগকে পশুর ন্যায় ক্রয় বিক্রয় করিত। দাসদাসীদিগের গৃহপালিত পশুর অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা ছিল না। অনেক সময় তাহাদিগকে হস্তপদাদি বন্ধন করিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করা হইত এবং যাহাতে তাহারা ক্রন্দন করিতে না পারে সে জন্য রজ্জুদ্বারা মুখ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখা হইত। একদিন একদল নিগ্রো দাসকে হৃদয়বিহীন প্রভুহস্তে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিয়া লিন্কনের কোমল হৃদয় বিচলিত হইয়া-ছিল। এই সময় হইতে তিনি দাস-ব্যব-সায়ের অস্তিত্ব লোপ করাইতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। লিন্কনের জীবন বহু সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য পবিত্র, কিন্তু দাস-ব্যবসায় প্রতিরোধের চেষ্টার দ্বারাই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্ হইয়াছে।

নিউ অরলিন্সে অবস্থানকালে আব্রা-হাম্ লিন্কনের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মিষ্টার ওফাট স্বদেশে একটী ব্যবসা-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া তাঁহাকে তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন মনস্থ করিলেন। আব্রাহাম্ মিষ্টার ওফাটের অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। মিষ্টার ওফাটের ব্যবসা-ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা ছিল না বলিয়া লিনকন্ কয়েক দিনের জন্য আপনার বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহার জীবনে এক ঘটনার সংঘটন হইয়াছিল। শারীরিক এবং মানসিক উন্নতিতেই মনুষ্যের পূর্ণাঙ্গতা। মানসিক উন্নতির সঙ্গে শারীরিক শক্তি লাভেরও দিকে আব্রা-হামের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার শরীরে অসাধারণ বল ছিল এবং সকল প্রকার ব্যায়ামেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। মানসিক ও শারীরিক দুই-প্রকার শক্তির সম্যক্ সংমিশ্রণেই তিনি

একজন অদ্বিতীয় পুরুষ হইয়াছিলেন। জেনিগাল নিড্‌হাম্ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার শারীরিক বলাধিক্যের কথা শুনিয়া অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে। আব্রাহাম্ তাহাতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি নিড্‌হাম্‌কে পরাজিত করিয়া তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। মিষ্টার ওফাটের নিকট কার্য্য করিতে যাইবার পূর্ব্বে আব্রাহাম্ কয়েক দিন জনকজননীর নিকট থাকিয়া সুখে কাল কাটাইলেন।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে আব্রাহাম্ লিনকন্ মিষ্টার ওফাটের কার্য্য-ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিউস্যালেমে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তখনও ওফাটের কারখানার আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় নাই। এই সময় নিউস্যালেমে কোনও এক কার্য্যালয়ে একটী কেরাণীর পদ শূন্য ছিল, লিন্‌কন্ ঐ পদপ্রার্থী হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও কার্য্য-কুশলতার কথা অবগত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। লিন্‌কন্ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতে-ছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই মিষ্টার ওফাটের ব্যবসাভাণ্ডার উন্মুক্ত হইলে তিনি কেরাণীর পদ পরিত্যাগ করিয়া ওফাটের কার্য্যে যোগদান করিলেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে সন্তুষ্ট হইয়া স্থানীয় অধিকাংশ লোকই তাঁহার নিকট দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আসিতেন। নিজগুণে আব্রাহাম্ ক্রমে ক্রমে নিউস্যালেম মধ্যে এক জন খ্যাতনামা পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। ক্রীড়ার সময় বালকগণ তাঁহাকে মধ্যস্থ (umpire) মনোনীত করিয়া সুখী হইত। তাঁহার মধুর ব্যবহারে বালক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিত। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ বহু-সংখ্যক লোক মিষ্টার ওফাটের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইত। একবার যিনি আব্রাহামের সহিত আলাপ করিতেন, তিনি তাঁহার সখ্যলাভে অভিলাষী না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। আব্রাহাম্ লিনকনও সাদরে সকলকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

লিন্‌কন্ একান্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন। ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া তিনি জীবনপথে অগ্র-সর হইতেন। অনেক ব্যবসায়ী প্রবঞ্চনা দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এরূপ চেষ্টা সাময়িক সফলতা আনয়ন করিলেও তদ্দ্বারা স্থায়ী মঙ্গল কখনই অর্জ্জিত হয় না। সত্য-পথ হইতে বিচলিত হইলে উন্নতি লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া সুখ্যাতির সহিত মিষ্টার ওফাটের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এক দিন একটী মহিলা কতকগুলি জিনিস কিনিবার জন্য আব্রা-হামের নিকট উপস্থিত হন। আব্রাহাম্

যত্নের সহিত তাঁহাকে দ্রব্যাদি দিয়া দুই ডলার ছয় সেণ্ট মূল্য চাহিয়া লইলেন। জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কখনও কাহারও সহিত প্রবঞ্চনা করেন না; সুতরাং স্ত্রীলোকটী মূল্য দিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে প্রস্থান করিলেন। আব্রাহাম্ রাত্রিতে হিসাব মিলাইবার সময় দেখিলেন যে, তিনি সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে ছয় সেণ্ট অধিক লইয়াছেন। স্বীয় অনবধানতাজনিত ত্রুটির জন্য তিনি আপনাকে শত শত বার ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া সেই রাত্রিতেই তিনি উক্ত মহিলাগৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে ছয় সেণ্ট প্রত্যর্পণ করিলেন এবং স্বীয় ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আব্রাহাম্ এ কথা উল্লেখ না করিলে মহিলাটী হয় ত কিছুই জানিতে পারিতেন না। কিন্তু সামান্য বিষয়েও কাহাকে বঞ্চিত করা পাপ বিবেচনা করিয়াই তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া আপনার ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলেন। আর এক দিন কার্য্যাদি সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমনের কালে একটী মহিলা তাঁহাকে অর্দ্ধ পাউণ্ড চা বিক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আব্রাহাম্ ব্যস্ততাবশতঃ ভ্রমক্রমে সিকি পাউণ্ড চা দিয়া অর্দ্ধ পাউণ্ডের মূল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আর সিকি পাউণ্ড চা লইয়া স্বয়ং সেই মহিলাগৃহে উপস্থিত হইলেন। মহিলাকে চা দিয়া তিনি নিজ কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও নিকট এরূপ কার্য্য তাদৃশ প্রশংসনীয় বিবেচিত না হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময় এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয় হইতেই প্রকৃত মহত্ত্ব সূচিত হইয়া থাকে।

আব্রাহাম্ এক দিকে যেমন বিনয়ী ও ভদ্র ছিলেন, দুর্ব্বৃত্তের দণ্ডের জন্য প্রয়োজন অনুসারে কঠোরতা প্রদর্শনে তেমনই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এক দিন প্রাতঃকালে লিন্‌কন্ কয়েকটী ভদ্র মহিলার সহিত দ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধীয় কথা-বার্ত্তায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার দোকানে প্রবেশ করিয়া অতি অভদ্রোচিত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। লোকের সহিত অকারণে বিবাদ করা এবং ভদ্রলোককে অপমানিত করা তাহার একটা অভ্যাস ছিল। কোন ভদ্রমহিলার সম্মুখে যে সেরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে নাই, ইহা তাহার মনে একবারও উদিত হইল না। লিন্‌কন্ ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া তাহাকে ভদ্রতার সহিত সেরূপ ভাষা ব্যবহারে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু সে লোকটী উত্তরোত্তর অভদ্রতাচরণ করিতে লাগিল। লিন্‌কন্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে দোকান হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। সে তখন ইতরোচিত ভাষায় লিন্‌কন্‌কে প্রহার

করিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। লিন্‌কন্ অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন, মহিলাগণ এখান হইতে চলিয়া যান, তাহার পর তোমার সাধ মিটাইব। মহিলাগণ প্রস্থান করিলে, লিন্‌কন্ দুর্ব্বৃত্তকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতি ভদ্র ব্যবহারে বিমুখ হইলেন না। দুর্বৃত্ত সেইদিন হইতে লিন্‌কনের অপকট বন্ধু হইল।

এইরূপ আরও একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। আব্রাহাম্ যেখানে অবস্থিতি করিতেন, সেখানে Clary-grove Boys নামে একদল দুর্ব্বৃত্ত বাস করিত। তাহাদিগের উপদ্রবে স্থানীয় লোকেরা ব্যস্ত হইয়াছিল। কতকগুলি যুবক ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি এই অত্যাচারীদের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাহারা আপনাদিগের শারীরিক বল এবং সাহসিকতার জন্য গৌরব করিয়া বেড়াইত এবং নবাগত ব্যক্তিগণকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত। যাহারা তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত না হইত, তাহারা দুর্ব্বৃত্তগণের হস্তে নানারূপে উৎপীড়িত হইত। কিন্তু আব্রাহাম্ লিন্‌কনকে, দুর্ব্বৃত্তগণ আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করে নাই, এবং বোধ হয় তাঁহার অসীম সাহস ও অসাধারণ শারীরিক বলের কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহার উপরে কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই। মিষ্টার ওফাট প্রায় সর্ব্বদাই আব্রাহামের বলবীর্য্যের সুখ্যাতি করিতেন। একদিন উক্ত সম্প্রদায়ের বিল ক্ল্যারি (Bill Clary) নামক এক দুর্ব্বৃত্তের সহিত মিষ্টার ওফাটের তর্কবিতর্ক হয়। তিনি দুর্ব্বৃত্তগণকে নিন্দা করিয়া বলিলেন যে, তাহারা কাপুরুষ, লিন্‌কন্ তাহাদের সমস্ত দলকেই উত্তম মধ্যম দিতে সক্ষম। বিল ক্ল্যারি স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদিগের শক্তির ও সাহসিকতার অশেষ প্রশংসা করিয়া আব্রাহাম্ লিন্‌কনের সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিল যে, লিন্‌কনের শক্তি থাকিলে তিনি তাহাদিগের দলস্থ জ্যাক্ আরমষ্ট্রংএর (Jack Armstrong) সহিত একবার কুস্তি লড়িয়া দেখিতে পারেন। এই বলিয়া সে লিন্‌কন্‌কে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিল। অকারণে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া আব্রাহামের অভ্যাস ছিল না; সুতরাং তিনি প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ইহাতে দুর্ব্বৃত্তগণ আব্রাহামের প্রতি নানারূপ কটুভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। তাহাদিগের অভদ্রজনোচিত ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আব্রাহাম্ তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষাদান করিতে মনস্থ করিলেন এবং সমস্ত দলের সম্মুখে আরমষ্ট্রংএর সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আব্রাহাম্ আরমষ্ট্রংএর ঘাড় ধরিয়া নাড়িতে লাগিলেন। পশুরাজের হস্তে পতিত হইলে ছাগশিশুর যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, আব্রাহামের হস্তে

আরমষ্ট্রং-এর সেইরূপ অবস্থাই হইয়াছিল। দুর্ব্বৃত্তগণ আব্রাহাম্ লিন্‌কনের অসামান্ত শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। শেষে আরমষ্ট্রং এবং তাহার দলস্থ অনেকেই আব্রাহামের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভদ্রভাবে দিন যাপন করিয়াছিল।

মিষ্টার ওফাটের অধীনে কার্য্যকালের শেষভাগে আব্রাহাম্ লিন্‌কনের ইংরাজী ব্যাকরণ অধ্যয়নের ইচ্ছা হয়। একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি অবসরক্রমে তাহা পাঠ করিতেন। পিতৃগৃহে তাঁহার জননীই তাঁহাকে শিক্ষয়িত্রীরূপে পাঠ বুঝাইয়া দিতেন, কিন্তু নিউস্যালেমে পুস্তকের কোনও অংশ বুঝিতে না পারিলে তাঁহাকে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সাহায্য লইতে হইত। এই সময় একজন সম্ভ্রান্ত আইনব্যবসায়ী নিউস্যালেমে পরিভ্রমণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। আব্রাহাম্ সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেন। স্বীয় উপার্জ্জনের কতক অংশ তিনি সাংসারিক অভাবমোচনে ব্যয় করিতেন এবং অবশিষ্টাংশে পুস্তক, সংবাদপত্রাদি ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ সুখ্যাতির সহিত মিষ্টার ওফাটের কার্য্য চালাইতেছিলেন, কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতায় হঠাৎ কারখানা বন্ধ হইয়া গেল। সুতরাং আব্রাহামের কার্য্যও এইখানে শেষ হইল।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা। *

জয় দেব ব্রহ্ম সনাতন,
দীননাথ করুণানিলয় !
তব ইচ্ছা করিতে সাধন
হয় যেন এ জীবন লয়।
ক্ষুদ্র আমি বুঝিনাক কিছু,
জীবন-সংগ্রামে ভয় পাই,
তুমি মোর থেক পিছু পিছু,
(যেন) ফিরে তব মুখপানে চাই।
ক্ষুদ্র আমি দুরবল অতি,
নাহি কোন ভরসা আমার ;
তুমি মোরে দাও শুভমতি,
নতুবা নাহিক গতি আর।
এই ঘোর ভবার্ণব-মাঝে,
একা আমি কোথা যাব ভেসে ;
যদি মোর জীবনের মাঝে,
নাহি লও ডেকে তব দেশে।
প্রলোভনময় এ ভুবন,
কে দেখাবে পথ মোরে আর,
তুমি নাথ ! দিয়া দরশন
দেখাইও ভবার্ণব পার।

* ৺বিভূবালা দত্তের লিখিত। ইনি ৺ পূজ্যপাদ উমেশচন্দ্র দত্তের তৃতীয় কন্যা।

স্ত্রীলোকের কাজ।

বিবাহের কিছু পরে যে দিন বালিকা প্রথম শ্বশুরঘর করিতে যায়, সেইদিন তার জীবনের দুই কালভাগের প্রাচীর স্বরূপ। উহার একদিকে সে স্নেহময়ী জননীর পার্শ্বে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দ্বারা চালিত ও পথদর্শিত হইয়াছে; আর অন্য দিকে তাহাকে পরের গৃহে অনেক পরিমাণে নিজে বুঝিয়া ও পথ দেখিয়া চলিতে হইবে। ঐ দিন হইতে কয়েক বৎসরের শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি স্থিরীকৃত হয়। আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি, কতশত প্রফুল্ল, কর্ম্মিষ্ঠ বালিকা কাজের অভাবে বিমর্ষ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের সম্পূর্ণ দোষ নাই। তাহাদের পিতামাতা ও আত্মীয়েরা তাহাদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ বলিয়া দেন না, এবং অল্প বয়স প্রযুক্ত তাহারা নিজেও কোন কাজ মনস্থ ও আরম্ভ করিতে অপারগ। স্কুলে যতদিন থাকে, বালিকারা লেখা পড়ার জন্য রীতিমত পরিশ্রম করে ও খেলিয়া বেড়ায়। কিন্তু বিদ্যালয়ে পড়িবার পর তাহাদের জীবনের কোন বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায় না। তাহারা সমস্ত সকালবেলা বিনা কাজে শুধু গল্প করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, স্নানাহারের পর হয়ত কোন অশ্লীল নবেল পড়িয়া বা নিদ্রাতে দু তিন ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। তাসখেলা সচরাচর বিকালবেলার সঙ্গী। এইরূপে প্রতিদিন, কত মাস কত বৎসর কাটিয়া যায়।

এইরূপে জীবন যাপন করিলে স্ত্রীলোকের চরিত্র যে উন্নত থাকিবে ও উন্নত হইবে আমরা এমন আশা কখনই করিতে পারি না। এইরূপে সময় কাটাইলে কাজে কাজেই তাহারা স্বার্থপর, ক্ষুদ্রমনা ও আত্মপ্রিয় হইয়া উঠে। পরের নিন্দায় তাহাদের বড় আনন্দ হয়, হিংসায় শরীর জর জর করে এবং নিজ সুখ ও বেশভূষাতেই তাহাদের সমস্ত মন পড়িয়া থাকে। সমস্ত বুদ্ধিমান্ পুরুষ ও স্ত্রীলোক এ প্রকার নারীদিগকে ঘৃণা করেন, এবং সহৃদয় লোকে তাহাদের জন্য ব্যথিত হন। সকলে বলে তাহারা কিছুই করে না। কিন্তু তাহারা দিনরাত জগতের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে। পূজিত নারী-নামে তাহারা কলঙ্ক দেয়; এবং যে স্ত্রীজাতি সংসারে মানুষকে মার্জ্জিত, পবিত্র ও মহৎ করিবার জন্য সৃজিত, সেই রমণীকুল তাহাদের জন্য পুরুষের দ্বারা ঘৃণিত ও দলিত হয়।

কথিত আছে, পূর্ব্বকালে লোকে পরশপাথর লাভের জন্য অত্যন্ত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিত। কিন্তু আমরা

যখন চারিদিকের কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন ভারতরমণীদিগের ক্ষয়প্রাপ্ত জীবন দেখি, তখন আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশ সহকারে খাটিয়া এমন কবচ-অন্বেষণে ব্যাকুল হই, যাহার স্পর্শে সোণার অপেক্ষাও মূল্যবান্ দ্রব্য আমাদের হস্তগত হইবে;—নিঃস্বার্থ উন্নত নারীচরিত্র—প্রতিগৃহের সেই রত্ন, এবং ব্যগ্রভাবে পরিশ্রম—সেই পরশপাথর। উহা দ্বারাই নির্ব্বোধ চঞ্চলা বালিকাদিগকে আমরা বুদ্ধিমতী ও বিশ্বাসী স্ত্রীলোকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি। উহার বলেই আমরা মুখরাকে সুশীলা ও অলসা নারীকে কার্য্যপ্রিয় করিতে পারি।

আমার এরূপ বোধ হয় না যে, কোন স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়া আলস্যে জীবন কাটায়; তবে বাল্যকালে ঐ অভ্যাসটী একবার শরীরগত হইয়া যাইলে অধিক বয়সে উহাকে ঝাড়িয়া ফেলা কঠিন। কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ বা লক্ষ্যের অভাবেই একটু একটু করিয়া লোকে প্রথমে অলস ও অবশেষে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

আমরা যদি প্রতি অকর্ম্মণ্য স্ত্রীলোকের ইতিহাস খুঁজি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ দেখিতে পাইব যে, প্রথমে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ ছিল না, পরে তাহার ঐরূপ অলস জীবন যাপনে ক্লান্তি উপস্থিত হইলে নিজের আপাততঃ আমোদের জন্য দুই একটী বিষয়ে আস্থা হয়; পরিশেষে ঐরূপ আত্মসুখ তাহাকে স্বার্থপর, আত্মপ্রিয়, অলস ও ভাল কর্ম্মে অক্ষম করিয়া তুলে।

সেই কারণে, সর্ব্বাগ্রে, আমরা কি কাজ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা সকলের ভাল রূপে জানা উচিত। কয়েক বৎসর হইতে আধুনিক বঙ্গমহিলাদিগের প্রতি নানারূপ দোষারোপ হইতেছে ও গালাগালি পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। প্রাচীনেরা বঙ্গবালাদিগকে কলিকালের মেয়ে বলিয়া উড়াইয়া দেন, আর নব্য পুরুষেরা তাহাদিগকে অশিক্ষিতা বলিয়া ঘৃণা করেন। বাঙ্গালীর মেয়েকে উপদেশ দিয়া সুশিক্ষিতা করিবার জন্য কত গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল যুবকেরা নিজে উপদেশ গ্রহণ করিলে ভারতের মহামঙ্গল হইত, তাঁহারা পর্য্যন্ত হিন্দুনারীকে লেক্‌চার দিতে বসিয়াছেন! ছেলেবেলায় একটা বড় মজার গল্প শুনিয়াছিলাম। কোন একজন ছেলে নাকি ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাকে জিজ্ঞাসা করিল—মা! বাবা কোথায়? আর মার কাছে যখন শুনিল যে, তাহার পিতা গরুর পাল লইয়া মাঠে গিয়াছে, সে অমনি পিতার খাবার মাথায় করিয়া মাঠে ছুটিল। স্ত্রীলোকের প্রতি বঙ্গীয় যুবকদের উপদেশ দেওয়া দেখিয়া ঐরূপই মনে হয়। কোন বালকের ধর্ম্মজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় হইতে না হইতে সে ভাবে, এখন অকর্ম্মণ্যা অশিক্ষিতা বাঙ্গালী-স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার বয়স তাহার যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এরূপ করাতে তাহাদিগেরও সম্পূর্ণ দোষ দিতে পারি না, কারণ, বর্ত্তমান বঙ্গবালার অবস্থা এরূপ শোচনীয়ই বটে।

যাহা হউক, এখন ওসকল কথা বার

দিয়া আসল কাজের কথা আরম্ভ করিব। স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই (ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে) একটী বিষয়ে সকলেরই একমত দেখা যায়। পরমেশ্বর জগতের কাজের জন্যই জীবাত্মার সৃজন করিয়াছেন; আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের এক এক নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে, সেই মনের মত কাজটা খুঁজিয়া লওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ সৌভাগ্যক্রমে নিজ সংসার, পরিবার বা প্রতীবাসীদের মধ্যেই নিজের অবকাশ-সময় কাটাইবার যথেষ্ট উপযুক্ত কাজ পান। তাঁহারা সচরাচর আপনাদের চারিদিকের লোকের প্রভূত উপকার করেন ও আপনারাও সর্ব্বদা সুখী ও প্রফুল্ল থাকেন। কখন কখন তাঁহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেও বাধ্য হন। কিন্তু মানুষের জীবন লোহার ন্যায়, মরিচা ধরিয়া ক্ষয় হওয়ার পরিবর্ত্তে ব্যবহার দ্বারা ক্ষয় হওয়াই ভাল। তাহা ব্যতীত, চালনা দ্বারা ঐ সকল পরিশ্রমশীলা নারী-দিগের ;কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, এবং মহা-বিপত্তির কালে তাঁহারা অনেক মহৎ কাজ করিতে সক্ষম হন। আবার, প্রতি গৃহে এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য স্পষ্টরূপে দেখিতে পান না বা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা কোন না কোন কাজে মন দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কি প্রকারে উহা আরম্ভ করিতে হয় তাহা জানেন না। তাঁহারা কাজের মহত্ত্বের কথা পুস্তকে পড়েন বা পিতা ভ্রাতাদিগের মুখে শুনেন, এবং নিজেরাও জগতে কিছু না কিছু করিতে ব্যগ্র; কিন্তু তাঁহারা কি কাজ করিবেন ও কিরূপে করিবেন?

সাধারণ নারীদিগের ঐরূপ সমস্যা ভাঙ্গিবার আশায় আমি স্ত্রীলোকদিগের কি কাজ ও উহা কিরূপে করা উচিত, সে বিষয়ে কতকগুলি পথ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু কোন্ কাজটা কোন্ স্ত্রীলোকের যোগ্য ও সাধ্যায়ত্ত তাহা বিচার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রতি নারীরই নিজ নিজ মনোমত কাজ ঠিক করিয়া লওয়া ও উহা দায়িত্বপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। এ সংসারে কোন্ লোকের হাতে কোন্ বিশেষ কাজটা পড়িলে উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, কেবল অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমরা সে শিক্ষা পাইয়া থাকি। কখন কখন বা হয়ত আমরা সাধ্যাতীত বা আমাদিগের অনুপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইব, কিন্তু অল্প দিন পরে তাহা ছাড়িয়া আর কোন বিষয়ে মন ফিরাইতে হইবে। যাহা হউক, আমরা ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, এ জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশেষ কাজ ও নির্দ্দিষ্ট কাজের স্থান আছে, তবে যতক্ষণ না আমরা ঐ কাজ বুঝিয়া ঐ স্থানটী পূর্ণ করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের নিশ্চেষ্ট বা সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে।

কয়েক বৎসর হইল আমাদের দেশে ধাত্রীবিদ্যা, ডাক্তারী প্রভৃতি কাজের পথ

ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের জন্য খোলা হইয়াছে। গরীব নারীদের ভদ্র ও স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জনই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আশা করি, পাঠিকারা এরূপ মনে করিবেন না যে, অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্তই পরিশ্রম করিতে শিখান আমার অভিপ্রায়। সামান্য গৃহস্থ বা দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা কখন কাজের অভাবে আলস্যে জীবন যাপন করে না; তাহারা নিজে না রাঁধিলে কেহ খাইতে পাইবে না; না খাটিলে ছেলেমেয়েদিগের ভাত কাপড় জুটিবে না—এই ভাবনা তাহাদিগকে যে কোন কাজে হউক সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখে। কিন্তু যে বালিকারা বা স্ত্রীলোকেরা সংসারে কোন কাজ করিতে বাধ্য হয় না, যাহাদের গৃহে পরিশ্রম করা বা বসিয়া থাকা দুইই সমান, যাহাদের জীবনের কোন লক্ষ্য নাই, কাজের কোন প্রয়োজন নাই, এরূপ ধনবতী বা মধ্যবর্ত্তিনী মহিলাদের মধ্যেই আলস্য ও অপদার্থতার অধিক আশঙ্কা। তাহাদের সমস্ত গৃহকর্ম্ম, এমন কি সন্তানপালন পর্য্যন্ত কতকটা দাসদাসীদিগের দ্বারা সাধিত হয়; সুতরাং তাহাদিগের জীবনে কাহারও ভাতের মাছিটা পর্য্যন্ত তাড়ানর প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থায় তাহারা কখন কখন ঐ চির-বিশ্রামে বিরক্ত হইয়া নিজ মনে —সংসারে আমি কি কাজ করিব?—এ প্রশ্নের উত্তর পর্য্যন্ত ভাবিয়া পায় না। কাজেকাজেই এরূপ অবস্থায় আলস্য-লোভের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহারা যে উহার উত্তর খুঁজিতেও প্রয়াস পায় না, এ বড় আশ্চর্য্য নহে। তাহারা যদি এরূপ স্থলে কাহারও দ্বারা আবশ্যকীয় কর্ম্মে দীক্ষিত ও পথপ্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে যে মহাপরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজের দ্বারাই তাহাদের চিরবিমর্ষ জীবন আনন্দময় হইবে, আস্থাহীন মন স্ফূর্ত্তিময় হইবে, এবং হিন্দুর সংসার অধিকতর বিশুদ্ধ ও সুখময় হইবে। তাহাদিগের মন প্রশস্ত হইবে ও মনোবৃত্তিসমূহ পুষ্টিলাভ করিবে। তখন তাহারা নিজেকেও মান্য করিতে শিখিবে, এবং অপরের দ্বারাও সম্মানিত হইবে। কারণ—

জীবন গম্ভীর, কিন্তু আনন্দের ঘর—
কর্ম্মেতে যাপিত হলে—সুখের সাগর—
হৃদয়ের খনি উচ্চ আশায় পূরিত।

কোন কোন লোক মনে করেন যে, নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিলে স্ত্রীলোকের কোমল রূপ কঠিন হইয়া যায়। এ প্রকার ভাবা অতি অবিবেচকের কাজ। কেননা, দরিদ্রপল্লী ও কৃষকবালাদের স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য ও যৌবনের লাবণ্য প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন? কোন নারীর অবয়বে যদি তাঁহার সদ্ভাবের ও সৎকার্য্যের প্রভা প্রতিভাত হয়, তবে সে সুন্দর মুখ যে আরও কত অধিক উজ্জ্বল হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? একজন অলস, অকর্ম্মণ্য, ম্লান নারীর মুখের সঙ্গে একটী কর্ম্মক্ষম সতেজ বদন মিলাইয়া দেখিলে কোন্‌টী বেশী মনোহর দেখায়? এসিয়া

ও ইউরোপের ধনবতী মহিলাদিগের মধ্যে কি আমরা এই প্রভেদ স্পষ্ট দেখিতে পাই না? আমাদের আসিয়িক ভগিনীরা ইউরোপীয় ভগিনীদের তুলনায় রূপে সৌন্দর্য্যে ও লাবণ্যে কিছুমাত্র হীন নন, কিন্তু ইউরোপীয় নারীদের কর্ম্মিষ্ঠ মুখের জ্যোতির কাছে আসিয়িক মহিলাদের প্রভা গ্যাসের পার্শ্বে বাতির আলোর মত মিট্‌ মিট্‌ করে। এমন কি, এক ভারতেই রাজপুত বা খোট্টা বালাদের সতেজ দীপ্তির নিকটে বঙ্গবালার রূপের নিস্তেজ কিরণ তত ভাল খোলে না। অন্য দিকে, কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন লোকের চক্ষু, তৎপর ও পরিশ্রমী লোকের চক্ষুর তুলনায় প্রাণশূন্য দেখায়। একজনের রূপ সৌন্দর্য্য সকলই আছে, কিন্তু কাজের অভাবে তাহা এত নিষ্প্রভ যে, উহা শূন্যতায় অলস জীবন ও বিমর্ষ আত্মার প্রকৃত পরিচয় দেয়। অন্য জনের রূপ সৌন্দর্য্য না থাকিলেও চক্ষুর উজ্জলতায় তাহাকে মনোহারিণী করিয়া তুলে, আর উহাতে তাহার কত জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয়ই পাওয়া যায়! ঐ চক্ষু দ্বারা তোমার অন্তরাত্মা তাহার আত্মার সঙ্গে কথা কহিতে পারে। সেইজন্য প্রকৃত উপকারী কাজ স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য না কমাইয়া বরং উহাকে দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

উদ্ধৃত।

[বসুমতীর অতিরিক্ত পত্র (১৪ই শ্রাবণ, ১৩১৭) হইতে]

চতুষ্পদ পক্ষী।

দক্ষিণ আমেরিকার ইংরাজাধিকৃত 'গায়না' দেশে হোয়াক্‌টসিন্ (Hoactzin) জাতীয় এক প্রকার ঝোঁটনবিশিষ্ট পক্ষী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই মনুষ্য-সমাগম-শূন্য নিবিড় বনের মধ্যে বাস করিয়া থাকে। হোয়াক্‌টসিন্ বন্য পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। বন্য পাতা খাইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের গায়ের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডিম্ব হইতে প্রসূত হইবার সময় ইহাদের চারিটী সুগঠিত পা বাহির হয়। শিশু হোয়াক্‌সিন্ কুলায় পরিত্যাগ করিয়া শাখা মৃগের ন্যায় বৃক্ষের শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিতে থাকে। এই সময় ইহাদিগকে পক্ষী বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না। 'গেছো ব্যাঙ্‌' বলিয়াই মনে হয়। প্রসূত হইবার পর ক্রমশঃ ইহাদের সম্মুখের পদযুগলের অঙ্গুলিযুক্ত থাবাগুলি খসিয়া যায় এবং সমস্ত হস্তটী বিস্তৃত হইয়া পক্ষের আকার ধারণ করে। ইহার পরই পালক জন্মাইতে থাকে।

পূর্ণাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই ইহাদের পূর্ব্ব আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এমন কি, যখন ইহাদের বৃদ্ধি ষোলকলায় পূর্ণ হয়, তখন হোয়াকূটসিনুকে দেখিলে মনে হয় না এবং অনুমান করাও যায় না যে, কোনও কালে ইহারা চতুষ্পদ ছিল।

নূতন সংবাদ।

১। রাজার অভিষেক—শুনা যাইতেছে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি ও সৈন্যদিগকে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইবে।

২। পুষ্পকরথ—আগামী শীত ঋতুতে কাপ্তেন উইণ্ডহাম, মিষ্টার ব্লো ও কাপ্তেন সেইটল্যাণ্ড পুষ্পকরথ লইয়া ভারতবর্ষে আসিবেন।

৩। মৃত্যু—বিখ্যাত ভক্ত কবি রজনীকান্ত সেন প্রায় আটমাস কাল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে থাকিয়া ২৮এ ভাদ্র মঙ্গলবার ৪৪ বৎসর বয়সে রাত্রি ৮-৩০ আটটা ত্রিশ মিনিটের সময় রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। বহুদিন হইতে তিনি কেন্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাত্রি ১১টার সময় দুইশতাধিক যুবক তাঁহার রচিত —

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে।
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমারি করুণা-চন্দনে।
কবে ভবের সুখ দুখ
চরণে দলিয়া।
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।"

এই গানটী গাহিতে গাহিতে নিস্তব্ধ রজনীকে জাগ্রত করিয়া তাঁহার নশ্বর দেহ নিমতলা শ্মশানঘাটে লইয়া গিয়াছিলেন।

এমন প্রকৃতির হাতে গড়া সরল সন্তান অতি বিরল। এমন শান্ত-পবিত্র-মধুর, দিব্যপরিমলোদ্গারী, সহজসুন্দর, নিরাবরণ, নির্ব্যাজ, নিখিলপ্রাণস্পর্শী কবিত্বের অবতারণায় অনেকে ভক্তকবি রামপ্রসাদের সঙ্গে ইঁহার উপমা দিয়া থাকেন। জীবলোকের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, এই সকল মহাপুরুষের অস্তিত্ব লোকে অধিক দিন ভোগ করিতে পায় না। যাহা হউক, সে রত্নাকর আজি ভৌতিক জগতে অদৃশ্য হইলেও, তৎপ্রদত্ত দিব্যজ্যোতিঃ রত্নরাজি, ধ্রুবতারার ন্যায় সহৃদয় হৃদয়াকাশে চিরদীপ্ত থাকিবে। শান্তিময় বিধাতা সেই স্বর্গীয় কবির আত্মাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

৪। বৌদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন গান্ধারদেশে প্রচুর বৌদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া

গিয়াছে। মৃত্তিকা খনন করিয়া বহু সংখ্যক সুন্দর বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি ও প্রাচীন প্রাসাদ বাহির হইয়াছে।

৫। জন্মোৎসব—গত ৩২শে ভাদ্র বামাবোধিনীর অষ্টচত্বারিংশ জন্মোৎসব উপলক্ষে বামাবোধিনীর কার্য্যালয়ে একটী সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও বামাবোধিনীর মঙ্গলের নিমিত্ত জগদীশ্বরের নিকট বিশেষ প্রার্থনা করেন। বামাবোধিনীর হিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ ও মহিলাগণ উক্ত সভায় যোগদান করিয়া বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

আমরা জাপান-প্রবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম, সি, ই, মহাশয় প্রণীত "জাপান প্রবাস" নামক একখানি পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

পুস্তকখানির উপরে সুবর্ণ অক্ষরে লতাপাতা মণ্ডিত নাম, বাঁধাই সুন্দর। ইহাতে দ্বাদশখানি চিত্র আছে।

গ্রন্থখানির বাহ্যিক আকার সুন্দর হওয়ায় যেমন স্বতঃই নয়নকে আকৃষ্ট করে, তেমনি গ্রন্থকর্ত্তার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং বর্ণনা সকল মনোরঞ্জক হওয়ায় চিত্তকে অধিকতর আবদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ করে।

ইহাতে জাপানীদের কি সামাজিক, কি নৈতিক, সমুদায় বিষয় অতি সুন্দররূপে বিবৃত আছে। এতদ্ভিন্ন তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের বর্ণিত বিষয়, সকলেরই চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানি উপাদেয় সন্দেহ নাই। জাপানপ্রবাসার্থীর পক্ষে ইহা অমূল্য গ্রন্থ। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রত্যেক যুবকের ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিকৃষ্ট উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে যে তাহাদের চরিত্রের উন্নতি এবং নীতিশিক্ষা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, অধিকন্তু জীবনের কি মূল্য, তাহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

জাপানরমণীদিগের বাক্য বিনিময় এবং ওবাজানের জীবনবৃত্তান্তবর্ণনায় কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকারের বা গ্রন্থের কোনও অপযশ হইতে পারে না। চরিত্রবর্ণনকালে চরিত্রের সমুদয় অংশ দেখান স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত সকল অংশই অতি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

এদেশের রমণীগণের ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহাদের অধিকাংশই নিজেদের জীবনের সহিত জাপানরমণীদের জীবনের তুলনা করিলে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন যে, কিরূপ অমূল্য সময় তাঁহারা বৃথা যাপন করিতেছেন।

পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শারদীয় পূজা সম্মুখে, পুরস্কার দিবার পক্ষে ইহা অমূল্য গ্রন্থ। অনেকে এই সময় উপন্যাসাদি ক্রয় করিয়া উপহার দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা যদি এইখানি উপহার প্রদান করেন, তবে পুরস্কৃত ব্যক্তি পাঠ করিয়া যে নিশ্চয়ই উপকৃত এবং প্রীত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকাটী পাঠ করিলেই পুস্তকের সার মর্ম্ম বুঝা যায়। জাপানী প্রহসনটী কেবলই হাস্যোদ্দীপক। মূল্যও অল্প, এক টাকা মাত্র। ইহা গ্রন্থপ্রণেতার নিকট প্রাপ্তব্য। আমরা গ্রন্থকর্ত্তার অপর দুইখানি পুস্তকপাঠের আশায় রহিলাম।

বামারচনা।

নামামৃত।

যবে বিকাশিলে রূপ চিন্ময় মোহন।—
যবে ঢালি সুধাবাণী　ভরিলে হৃদয়খানি
নবানুরাগেতে মন করিলে মগন,—
ফুটাইলে প্রেমময়　নবপ্রেম-কিশলয়
জীবনতরুতে করি অমৃত সিঞ্চন ;—
তখন কি সুধাভরা লাগিলে গো মনোহরা
অচিরেই সব হতে হলে প্রিয়ধন,
নাহি চাহি কারু পানে তোমারেই প্রাণে প্রাণে,
পরম আত্মীয় বলি বরিল গো মন।
সেই দিনে বুঝিলাম　কি সুমিষ্ট তব নাম,
নামে কেন ভক্তি অশ্রু ঢালে ভক্তগণ,
নামের অমৃতে মোর　হৃদয় হইল ভোর,
কিসে মধুময় তারে করিলে এমন!
পাপতাপহারী নাম　করিয়াছ গুণধাম
সংসার-গরল-নাশে নামামৃত ধন,
বিষম জীবন রণে　নাম বল ঢালে মনে
নাম ই) রাখে গো চিত্ত প্রেমে নিমগন।
নাম-পরিমল গন্ধ　করিল এমনি অন্ধ
মম মন মধুপেরে যেথা তব নাম,
ইচ্ছা হল ছুটে যাই,　নাম শুনি নাম গাই,
নামেতে মাতাই সবে মাতি অবিরাম!
পরগৃহে স্বভবনে　তরণীতে বাষ্পযানে
পান করিলাম সুধা—নাম-সঙ্কীর্ত্তন,
বিহগ-কাকলীতানে　পথিকের নৈশ গানে
সর্ব্বত্র করিনু নামামৃত আহরণ।
যে গ্রন্থে ও প্রিয় নাম, ঢালে সুধা অবিরাম,
সেই হল সরবস্ব জীবন-জীবন,
দিবানিশা তারে লয়ে,　রহিনু উন্মত্ত হয়ে,
তবু না মিটিল দীপ্ত আশা আকিঞ্চন!
ও নাম কাগজে পত্রে　মরমের ছত্রে ছত্রে
তুলিল কি ভাবোচ্ছ্বাস মনোবিমোহন,
দ্রুত সেই নামধন চাপি বক্ষে ঘন ঘন
বিগলিত প্রেমানন্দে করিনু চুম্বন!

নামপ্রীতি একবিন্দু জাগায়েছ দীনবন্ধু,
তাতেই দেখিনু এত প্রীতির স্বপন,
যুগ-যুগান্তর ধরি তোমাতে মিশাতে হরি!
ছুটিব যখন হব কি ভাবমগন!

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসবে দত্তমহাশয়ের স্মৃতি।

এবে তুমি নাহি এ ধরায়;
সকলে তোমার তরে,
হতাশ হইয়া পড়ে,
আঁখিপূর্ণ অশ্রুবারি সদাই ঝরায়।

২

সেদিন আসিলে তুমি মোদের ভবনে,
উপাসনে তুষ্ট করি,
আনন্দেতে মন ভরি,
আজ তুমি বসে আছ কাহার সদনে?

৩

তোমার লেখিকাগণ করে হাহাকার।
শান্ত দিদি চারুশীলা,
তব কন্যা উষাবালা;
চঞ্চল হইল মন প্রাণ সবাকার।

৪

আনন্দে ছাপিতে তুমি বামার রচনা,
সেই তুমি কোথা আজ,
মস্তকে পড়িল বাজ,
আজি সবে সহিতেছি অসহ্য যাতনা।

৫

কোন দুঃখ কোন ব্যথা দাওনিকো প্রাণে।
সুখেতে ছিলাম মোরা,
আজ সবে দুঃখভরা,
সর্ব্বদাই নাচিতেছে তব মুখ মনে।

৬

যাও তবে মহাপ্রাণ, পুণ্যধামে যাও,
সুখেতে স্বর্গেতে বসি,
মুখখানি হাসি হাসি,
আনন্দে বিভুরে * তুমি কোলে লও।

কুমারী সুনীতি দেবী,
ভেলুপুরা, বেনারস।

* বিভু—স্বর্গীয় দত্তমহাশয়ের কন্যা বিভুবালা।

২১১৩ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 566. October, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৬ সংখ্যা। { আশ্বিন, ১৩১৭। অক্টোবর, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন আবিষ্কার—(১) মার্কিণ-বৈজ্ঞানিক এডিনসন সাহেব বিদ্যুদ্বলে পুতুলের মুখ হইতে কথা বাহির করিবার এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এত দিন ফনোগ্রাফ ও গ্রামোফনে গান, কথা প্রভৃতি শুনা যাইত। এখন হইতে সাক্ষাৎ ভাবে মানুষের প্রতিমূর্ত্তিই কথা কহিবে। বিজ্ঞানের বলে কত আশ্চর্য্য আবিষ্কারই হইতেছে!

(২) গত বৎসর গৌতম বুদ্ধের দেহাস্থি পেশোয়ারের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। সেই অস্থি ব্রহ্ম মান্দালয় সহরে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সীমান্ত প্রদেশেই সম্প্রতি আবার বহুসংখ্যক নূতন বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ প্রস্তরভবন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশের সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্পুনার সাহেব এই সকল মূর্ত্তি প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা। এ অঞ্চলে প্রাচীনকালে যে সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাটের রাজধানী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দরিদ্রাবাস—শুনা যাইতেছে, কলিকাতা সহরের সংস্কার হইবে। তাহাতে দরিদ্র লোকদিগের সহরে বাস করার বড়ই গোলযোগ হইবে, এইজন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটি দরিদ্রদিগের বাসের জন্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছেন। অবশ্য ইহার জন্য তাহাদিগকে ভাড়া দিতে হইবে। দরিদ্রের অবস্থার উপযোগী ভাড়ার ব্যবস্থা হইলেই ভাল হয়।

সৈনিকদিগের বিধবাগণ ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা—সম্প্রতি নিয়ম হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সেনাগণের বিধবা পত্নী এবং ছোট ছেলে-দিগের ও য়ুরোপীয় অনাথা স্ত্রী ও

অনাথ শিশুদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্ত মাসিক অর্থসাহায্য করা হইবে। প্রত্যেক বিধবার জন্ত মাসিক ২৫৲ টাকা ও প্রত্যেক শিশুর জন্ত মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল শিশুর পড়িবার বয়স হইয়াছে, তাহাদিগকে স্কুলে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করা হইবে।

রামচন্দ্র ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা এবং সীতাদেবী রাণী হইলেন। রামের অপ্রতিহত শক্তি—তাঁহার শাসক আর কেহই নাই। কিন্তু সেই শক্তি তিনি ধর্ম্ম, ন্যায় ও দয়ার সামঞ্জস্যে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। গুরুজনদিগকে ভক্তি, ভ্রাতা ও বন্ধুদিগকে প্রীতি, মাননীয় ব্যক্তিদিগকে সম্মাননা এবং প্রজাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। রামরাজ্যে কাহারও কোনও অভাববোধ রহিল না। সুখ ও শান্তি ঘরে ঘরে বিরাজিত হইল। কৈকেয়ী ও মন্থরা, দশরথ ভূপতির জীবিতকালে যেরূপ সম্মানিতা ও গৌরবান্বিতা ছিলেন, রামের রাজত্বকালেও তাহার কোনও অন্যথা হইল না। সক্ষম ব্যক্তির ক্ষমা কতই মহানুভবতার পরিচায়ক!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধাতা রামের অদৃষ্টে সুখ শান্তি বড় বেশী দেন নাই। তাই রাজকর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া রামচন্দ্রকে এক অভাবনীয় ঘটনায় আত্মবলি দিতে হইল, আপনাকে অতল দুঃখসাগরে ডুবাইয়া দিতে হইল।

সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ রাম রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। যাহাতে সাধারণের সুখ-শান্তি, তাহাতে নিজের যতই ক্ষতি হউক, যতই অসুবিধা হউক, রাজাকে তাহা করিতেই হইবে। কেননা তিনি সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিকৃতিস্বরূপ রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাকেই "নিষ্কাম ধর্ম্ম" বলে। সেকালের ক্ষত্রিয় রাজগণ এইরূপই করিতেন।

রাজ্যে রাজার প্রতি প্রজামণ্ডলী সন্তুষ্ট কি না, তাহাদের কোন অভাব বা অশান্তি আছে কি না, তাহা জানিবার জন্ত রামচন্দ্রের গুপ্তচর নিয়োজিত ছিল। গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে রামকে জানাইত। সীতা দেবী সতীত্ববিষয়ক পরীক্ষা লঙ্কায় সমুদ্রকূলে দিয়াছিলেন, অযোধ্যার প্রজাগণ তাহা প্রত্যক্ষ করে নাই। মানুষের মধ্যে সরল ও কুটিল দুই রকম

লোক আছে। যাহারা সরলচেতা, তাহারা সেই অগ্নিপরীক্ষার কথা শুনিয়া তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিল, আর যাহারা কুটিলচেতা, তাহারা সতী-কুল-শিরোমণি সীতার চরিত্রে অমূলক সন্দেহ এবং রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপরে বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। রামের গুপ্তচর গোপনে তাহা শুনিয়া আসিল।

সঙ্গোপনে রাম এই অপবাদের কথা শুনিলেন। সতীকুলশিরোমণি পতিপ্রাণা ধর্ম্মপত্নীর চরিত্রে এ নিষ্টুর লোককলঙ্ক-কথা রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে আনাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন আগ্নেয়-পর্ব্বত হইতে যেমন ধূম নিঃসরণ হইতে থাকে, দুঃখ ও অভিমানে রামের নয়নকমল হইতেও সেইরূপ বাষ্পবারি বহির্গত হইতেছে। তাঁহারা বিস্মিত ও ভয়াকুলচিত্তে রামের পাদবন্দনা করিলেন।

তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইয়া রাম বলিতে লাগিলেন,—"হে নরেশ্বরগণ! আমার সর্ব্বস্ব তোমরা; তোমরা আমার জীবন; তোমাদিগের কৃত রাজ্য আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্রার্থ অবগত, এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়াছ * * *। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। আমার সীতা সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা উঠিয়াছে, তাহা শুন, মন অন্য দিকে দিও না। জনপদে এবং পৌরজনমধ্যে আমার সুমহান্ অপবাদরূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, তাহাতে আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে; আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকের সংকুলে জন্মিয়াছেন। আর যশস্বিনী সীতা যে বিশুদ্ধ-স্বভাবা,পতিব্রতা, সে কথাও আমার অন্তরাত্মা জানিতেছে *। সেই নিমিত্ত আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান্ অপবাদে আমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে সুমহান্ অপবাদ রটিয়াছে। * * * মহাত্মা ব্যক্তিদিগের কীর্ত্তির জন্যই যত্ন। হে পুরুষর্ষভগণ! আমি রাজমুকুট ধারণকালে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—'প্রজারঞ্জনার্থে আমি আমার রাজ্য, ধন-সম্পদ, আমার প্রাণ ও আমার প্রাণাধিকা জানকীকেও অকাতরে পরিত্যাগ করিব।' অতএব তোমরা দেখ! আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি। আমি ইহার অধিক দুঃখ জগতে আর দেখি না। অতএব হে সৌমিত্রে! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া তপোবনদর্শনচ্ছলে দেশান্তরে ত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তীরে বাল্মীকির স্বর্গতুল্য আশ্রম। হে রঘুনন্দন! সেই বিজনদেশে তুমি ইহাঁকে শীঘ্র ত্যাগ

*"অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীং।"

করিয়া ত্যাইস। আমার বচন রক্ষা কর।” ইত্যাদি।

রামচরিত্রে এই সীতানির্ব্বাসন একটী দুরপনেয় কলঙ্ক বলিয়া খ্যাত। রাম যদি জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া পতিব্রতা ভার্য্যাকে লইয়া বনবাসী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য পালন করা হইত, এবং এই দুরপনেয় কলঙ্ক হইত না।

কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ রামচন্দ্র সামান্য গৃহী নহেন, রাজা। রাজকর্ত্তব্য-পালনই তাঁহার সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম। যশস্বী যিনি, তিনি সকলেরই ভক্তি ও বিশ্বাসভাজন; কিন্তু অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি কাহারও ভক্তি বা বিশ্বাস প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য “লোকরঞ্জন”, অর্থাৎ “সাধারণের ভক্তি ও বিশ্বাসের উপযুক্ত হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

এখন রামের উপায় কি? তিনি যদি জনসাধারণকে ডাকিয়া সীতার বিশুদ্ধতার কথা, সীতার সতীত্বের কথা এবং সীতার পাতিব্রত্যের কথা বলেন, তাহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ এবং সেই দুরাত্মা রাবণের গৃহে দীর্ঘকাল সীতার একাকিনী বাস অথচ রাম কর্ত্তৃক সীতাগ্রহণ এই সকল কারণে তাহাদিগের রামের প্রতি যে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, সীতাকে পরিত্যাগ ভিন্ন তাহা নিরাকরণ করা অসম্ভব। তাই রাজকর্ত্তব্যপালনার্থে নিতান্ত হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের মত রামকে ভার্য্যা নির্ব্বাসন করিতে হইল।

কিন্তু রামচন্দ্র কর্ত্তব্যপরায়ণ বীর হইলেও হৃদয়হীন নিষ্ঠুর নহেন। তাঁহার সেই জগতের সহায়, সংসারের লক্ষ্মী, জীবনের সুখ সৌভাগ্যের প্রতিমা ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিতে প্রাণ-পরিত্যাগরূপ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি লোকাতীত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন।

রোরুদ্যমান ও জীবন্মৃততুল্য লক্ষ্মণ যখন সীতাকে বাল্মীকি-আশ্রমের সন্নিধানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন, তখন সেই গর্ভবতী, নিরপরাধা, পতিব্রতার অবস্থা সকলে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ কর! কিন্তু সীতা রাম-হৃদয় সর্ব্বদা নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইতেন; তাই সে অবস্থায়ও তিনি বলিয়াছেন, “আর্য্যপুত্র লোকাপবাদ দূর করিতেই আমাকে নির্ব্বাসন করিয়াছেন; আমি যে স্বপ্নেও তাঁহার কাছে অবিশ্বাসিনী নহি, তাঁহার সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আছে।” আবার সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া রাম যে মরণাধিক ক্লেশ সহিতেছেন, তাহাও সীতা বুঝিতে পারিলেন। সীতা প্রার্থনা করিলেন, “আমি জন্মে জন্মে যেন রামকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হই”! এই সর্ব্বংসহা দেবী পতিব্রতাকুলের অলঙ্কার।

সীতার সংবাদ জানিয়াই মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ হইলেন। রামের মনোগত অভিপ্রায় ইহাই ছিল। যাহা হউক, পিতার নিকটে পুত্রী যেরূপ

শান্তিতে ও নিরাপদচিত্তে বাস করে, বাল্মীকির নিকটে জানকীও সেইরূপ কালযাপন করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে সীতার যমজ কুমারদ্বয় ভূমিষ্ঠ হইল। বাল্মীকি কুশ ও লব নামে তাহাদের নামকরণ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগকে সুযোগ্য শিক্ষা দিয়া মনুষ্যত্ব প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সীতানির্ব্বাসনের বহুদিন পরে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে উদ্যত হন। রামচরিত্র কর্ত্তব্যপালনে বজ্রের ন্যায় কঠোর, অথচ সহৃদয়তায় ফুলের মত কোমল। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হয় (১), কাজেই যজ্ঞানুষ্ঠানে সস্ত্রীক হইতে হয়। সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্র পরার্থের জন্যই প্রিয়তমা পত্নীকে বনবাস দিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মচারিণী জানকীর প্রতি, তাঁহার প্রেম বর্ষায় জলাশয়ের মত তাঁহার হৃদয়ে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। সেইজন্য তৎকালপ্রচলিত বহুবিবাহের কথা রামের পবিত্র চিত্ত স্পর্শ করিতে পারিল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তব্ধ হইয়া দেখিল, রামচন্দ্র সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই সঙ্গে যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। যে একনিষ্ঠতা দাম্পত্যপ্রেমের প্রাণ স্বরূপ, রামহৃদয়ে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান!

অশ্বমেধযজ্ঞকালে মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডালাদি সকলে আমন্ত্রিত হইয়া অযোধ্যাপুরে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকিও কুশ-লবকে লইয়া রামচন্দ্রের নিকটে আসিলেন। যথাসময়ে তিনি জানকীর বর্ত্তমান বৃত্তান্ত এবং লব-কুশের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং সেই সমবেত লোকমণ্ডলীর মধ্যে রামকে সীতাসতীকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সীতা যে পতিব্রতা সাধ্বী, এ কথা মহর্ষি নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

তখন সেই মহাসভায় স্থিরীকৃত হইল যে, সীতা দেবী এই মহা জনসঙ্ঘের সমীপে রামচন্দ্রের সাক্ষাতে পবিত্রতার পরীক্ষা দিলে রাম সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন।

তখন রাত্রি প্রভাত হইলে, পুনরায় অসংখ্য মানবমণ্ডলী, রাজা রামচন্দ্রের সহিত সেই মহাসভায় আসীন হইল। মহর্ষি বাল্মীকি সবিশেষ জানিয়া সেই জনমণ্ডলীসমীপে আসিতে লাগিলেন।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—"সীতা কৃতাঞ্জলি, বাষ্পাকুলনয়না এবং অধোমুখী হইয়া মনোমধ্যে রামকে চিন্তা করিতে করিতে সেই ঋষির (বাল্মীকির) পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মের অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায়, বাল্মীকির পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সেই সীতাকে দেখিবামাত্র সেই স্থলে অতি মহান্ সাধুবাদ হইতে লাগিল। তৎপরে দুঃখজ অতি মহৎ শোকহেতু ব্যথিতান্তঃকরণ জনসমূহের বিপুল হলহলা শব্দ উত্থিত হইল। দর্শক-

(১) সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।

বৃন্দ মধ্যে কতকগুলি সাধু রাম, কতকগুলি সাধু জানকী, কতকগুলি উভয়ই সাধু এই প্রকার কহিতে লাগিল।

"তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি, সীতার সহিত জনবৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"হে দাশরথি! ধর্ম্মচারিণী, সুব্রতা, এই সীতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রমসমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাব্রত রাম! ইনি এক্ষণে (লোকাপবাদাতীত) প্রত্যয় তোমার নিকটে প্রদান করিবেন, তুমি অনুজ্ঞা প্রদান কর। এই দুর্দ্ধর্ষ যমজ জানকীপুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি। হে রঘুনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি মিথ্যা বাক্য স্মরণও করি না, ইহারা তোমারই পুত্র। * * *

হে রাঘব! আমি দিব্য জ্ঞাননেত্রে সীতাকে বিশুদ্ধা জানিয়াই বননির্ঝরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অপাপা, পতিপরায়ণা, শুদ্ধচারিণী, লোকাপবাদভীত তোমার নিকটে প্রত্যয় প্রদান করিবেন। হে রাজনন্দন! যেহেতু তুমি তোমার এই প্রিয়তমাকে বিশুদ্ধা জানিয়াও লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্যই দিব্য জ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ করিয়াছি।"

রাম বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই পতিপ্রাণা জানকীকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সমস্ত জনগণের সমীপে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য। হে ব্রহ্মন্! আপনার পবিত্র বাক্যেতেই আমার প্রত্যয় হইয়াছে এবং বৈদেহী ও লঙ্কামধ্যে পূর্ব্বকালে দেবগণসমীপে অগ্নিপরীক্ষা প্রদান ও শপথ করিয়াছেন, তজ্জন্যই আমি ইহাঁকে, গৃহে আনিয়াছিলাম। হে ব্রহ্মন্! এই জানকীকে আমি পবিত্রা জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছি। আর যমজ কুশীলব আমারই পুত্র, তাহা আমি জানি; কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। জগন্মধ্যে পবিত্রা জানকীতে আমার প্রীতি অবিচলিত।

অনন্তর সীতার শপথ বিষয়ে রামের অভিপ্রায় জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন এবং আদিত্যগণ; বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, বায়ুগণ, সকল সাধ্যগণ, সকল পরমর্ষিগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, সকলে হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া সেইখানে আগমন করিলেন।

তখন দিব্য গন্ধবিশিষ্ট এবং সর্ব্বপাপপুণ্যসাক্ষী পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই জনবৃন্দকে আহ্লাদিত করিল। সত্যযুগের ন্যায় সেই আশ্চর্য্য অচিন্তনীয় ব্যাপার, সকল রাষ্ট্র হইতে সমাগত জনমণ্ডলী সমাহিত হইয়া দেখিতে লাগিল। কষায়বস্ত্রপরিধানা সীতা দেবী সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখী, অধোদৃষ্টি

এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপে কহিতে লাগিলেন,—

'যদি আমি মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে পৃথিবী দেবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। ১

"যদি কায়মনোবাক্যে আমি রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। ২

"আমি রাম্ ভিন্ন জানি না, আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। ৩ *"

বেল ফুলের মৃদু মধুর সৌরভ যেমন সন্নিহিত জনগণকে মুগ্ধ করিয়া বায়ু-তরঙ্গে দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়, পাপিয়ার কলকণ্ঠ যেমন আকাশতলে মধুবর্ষণ করিতে করিতে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে, সেইরূপ মধুরভাষিণী সীতাদেবীর এই অমৃতমাখা, শোক-ক্ষোভ-অভিমানপূর্ণ অমৃতমাখা শপথ, সেই মহতী জনতাকে মুগ্ধ করিয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, প্রতি হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত ও পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! সে অমৃতকণ্ঠী, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী দেবী কোথায়? এই শপথের অবসানে তাঁহার দেহের অবসান হইয়াছে! সতীর বাক্য সফল হইয়াছে! সত্য সত্যই পৃথিবী দেবী সেই লজ্জিতা, দুঃখিতা পাপপরিশূন্যা, পতিব্রতা সাধ্বীকে তাঁহার স্নেহের কোলে আশ্রয় দিয়াছেন! সতীত্বের সহিত সীতা চলিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রামচন্দ্রের জীবন বহু পরীক্ষার স্থল। কিন্তু এইবার সেই ভীষণ পরীক্ষা চরম সীমায় পৌছিল। তথাপি সে চিত্তজয়ী, সে আত্মজয়ী বীর জীবনের অবশিষ্টকালও তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

এই পরম পুণ্যময় রামচরিত সংক্ষিপ্ত-রূপে আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, রাম বলবান্, রণনীতিজ্ঞ, সুদক্ষ, জ্ঞানী, বিবেচক, বুদ্ধিমান্, ভক্তি-মান্, প্রীতিমান্, শরণাগতপালক, শত্রুর প্রতিও ক্ষমাশীল, নীতিপরায়ণ, সদাশয়, সহৃদয়, তেজস্বী, মনস্বী, শাস্ত্রানুধ্যায়ী, সহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধচেতা ধার্ম্মিক, প্রেমিক এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হউন বা না হউন, লোকাতীত-বহু গুণসম্পন্ন। তাই বলিতেছি, তিনি দেবতা হউন, আর মানবই হউন, সকলকালে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বজনের পূজা নমস্য এবং ভক্তির পাত্র। তাঁহার গুণাবলী পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয় পবিত্র হয়, কৃতার্থ হয়, শ্রম সার্থক হয়। সকল মানবই কবিবর ভবভূতির সহিত বলিতে পারেন—

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোনু বিজ্ঞাতু-
মর্হতি॥'

শ্রীমা—

* যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ ১
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ ২
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥৩

হিমালয়প্রদেশে।

হিমাচল দেখিবার বাসনা বহুকাল হইতে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। কয়েক বৎসর হইতে প্রতি বৎসরই যখন আমার পরিচিত ব্যক্তিগণ হিমালয়ে গমন করিতেন, তখন আমারও হিমাচল দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিত. কিন্তু "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" কবির এই উক্তি স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিতাম।

গত চৈত্রমাসে হঠাৎ আমার ভাগ্য-দেবতা প্রসন্ন হইলেন। শুনিলাম, আমার বহুকাল-পোষিত আকাঙ্ক্ষা এবার সফল হইবে। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

৩ রা এপ্রিল অপরাহ্নে দার্জ্জিলিঙ্গ মেল ট্রেণে আমরা যাত্রা করিলাম। আমার পূজনীয়া শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী বহুবার এ পথে যাতায়াত করিয়াছেন। তিনি সঙ্গে থাকাতে আমি নিশ্চিন্তচিত্তে যাত্রা করিলাম। আমার শরীর বাল্যাবধি কিছু কৃশ, দুর্ব্বল, ট্রেণ, ষ্টীমার প্রভৃতিতে যাতায়াতে বড় কষ্টবোধ হয়। আমি সমস্ত পথ শুইয়া শুইয়া অনাহারে কাটাইলাম। প্রাতে যখন শিলিগুড়ি ষ্টেশনে নামিয়া, ছোট রেলগাড়ীতে উঠিলাম, তখন আমার খোকার আনন্দ দেখে কে? সে তাহার দিদির (আমার ভাগিনেয়ীর) সঙ্গে অনেক গল্প জুড়িয়া দিল। তাহার দিদি ২।৩ বার এদিকে আসিয়াছে। সে ছোট ভাইটীকে তাহার এ প্রদেশের অভিজ্ঞতার বিষয় বলিয়া বিস্মিত করিয়া দিতেছিল। ইহাদের এই আনন্দপূর্ণ উৎসাহপূর্ণ জীবন দেখিয়া, নিজের বাল্যকালের কথা মনে উঠিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল।

ট্রেণ দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতগাত্রে আরোহণ করিতে লাগিল। এই বন্ধুর পর্ব্বতগাত্রে কিরূপ সুকৌশলে লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা বহুবার পাঠ করিয়াছি। বন্ধুগণের মুখেও সবিশেষ শুনিয়াছি। কিন্তু আজি নিজের চক্ষে দেখিয়া এই কলিযুগের বিশ্বকর্ম্মার নৈপুণ্যকে বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

লৌহ-মাতঙ্গ ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে হিমাচল আমাদের নয়নপথবর্ত্তী হইল। এই সেই হিমাচল; শৈশবে যখন ভাল করিয়া কথা বলিতে শিখি নাই, তখন পিতা যাহার বর্ণনাসূচক কবিতা আমাকে শিখাইয়াছিলেন। বাল্যাবধি যে হিমাচল দর্শনের আশা হৃদয়ে জাগ্রত, সেই হিমাচল আজ আমার সম্মুখে। আমি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার শোভা দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রাণ ভরিয়া নিশ্চিন্তমনে তাহা দেখিতে পারিলাম না। চঞ্চল-প্রকৃতি খোকার

অস্থিরতা আমাকে ভীত করিয়া তুলিল। পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া খোকাকে তাঁহার কোলে লইয়া বসিলেন। তবুও আমার ভয় গেল না। মাতার হৃদয় এমনি অকারণ-আশঙ্কাপূর্ণ!

বেলা দশটার সময় আমরা কার্সিয়ঙ্গে পঁহুছিলাম। এইখানে আমাদের বাসের জন্য একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। আমরা সেখানে উঠিলাম। আমার বড় ননদ দার্জ্জিলিঙ্গে থাকেন, তাঁহার পাচক আসিয়া আহারীয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা স্নানান্তে আহার করিয়া একটু সুস্থবোধ করিলাম। বিশ্রামান্তে ঘরসংসার গুছাইয়া লইলাম।

আজ ৪ঠা এপ্রিল। ৯ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে আমি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমার জীবনে বিধাতার করুণা ও নিজের অযোগ্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সায়াহ্নে শ্বশুর মহাশয় আমার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

পরদিন প্রাতে আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। এরূপ বেড়ান আমার এই প্রথম। তাই একটু বাধ বাধ ভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। অল্প খানিকটা বেড়াইয়া ফিরিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বাড়ীখানি ছোট। বন্দোবস্তও তত ভাল নয়। কিন্তু ইহার চারি দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। আহারাদির পর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কোলাহল-মুখরিতা কলিকাতা নগরী হইতে সদ্য-আগতা আমি একাকিনী পশ্চাদ্দিকের বারান্দায় বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে থাকিতাম। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল পর্ব্বতমালা, দূর পর্ব্বতস্থিত চা-বাগানের কুঠিগুলি ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। আর কোথাও মনুষ্যবাসের চিহ্ন নাই। একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয়া নদী প্রবাহিতা হইতেছে। আমি নির্নিমেষলোচনে এই শোভা দেখিতে থাকিতাম। কখনও বা হঠাৎ কুহেলিকাতে সমস্ত আবরিত হইত। যেন প্রকৃতিরাণী লজ্জাবনতা রমণীর ন্যায় বসনাঞ্চলে স্বীয় কমনীয় শোভা ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। আবার পরক্ষণেই হয়তো চঞ্চলা বালিকার মত রৌদ্রকরোজ্জ্বলা প্রকৃতি রাণী হাসিয়া উঠিলেন! আবার কিছুক্ষণ পরেই দেখি, শোকক্লিষ্টা রমণীর ন্যায় নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। একি বিচিত্র শোভা! বহির্জগতের এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি দেখিয়া মানবজীবনের বিচিত্রতার কথা মনে হইত। যে পরম দেবতা অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে এত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন, বিস্ময় ভক্তি-ভরে তাঁহারই চরণে প্রাণ অবনত হইয়া পড়িত।

আমার বড় ননদঠাকুরাণীর সাদর আহ্বান ৪।৫ দিনের মধ্যেই আমাকে দার্জ্জিলিঙ্গে লইয়া গেল। আমি রাত্রে দার্জ্জিলিঙ্গে পৌঁছিলাম। প্রাতে উঠিয়াই

তুষারধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলাম। কি অমল ধবল কান্তি! মলিনতার লেশমাত্রও ইহাকে স্পর্শ করে নাই। এত নির্ম্মল, এত সুন্দর. এইজন্যই বুঝি মহাকবি ইহাকে "দেবতাত্মা" বলিয়াছেন!

কার্সিয়াঙ্গের শীত তত বেশী নয়। কিন্তু দার্জ্জিলিঙ্গের প্রবল শীত আমার দুর্ব্বল দেহে সহ্য হইল না। কয়েকদিন সর্দ্দিতে বড় কষ্ট পাইলাম। তাই প্রথম কয়েকদিন, বড় একটা, বেড়াই নাই। ক্রমে শরীর একটু সুস্থ হইলে পর প্রায় দুই বেলাই বেড়াইতাম। এই সময় হিমালয়ের বসন্তকাল। পর্ব্বতগাত্র যেন পুষ্পে আচ্ছাদিত। কত রকমের ফুল! এ যেন ফুলেরি দেশ!! ফুলের আবার কত রঙ্গ! যে রঙ্গের কাছে যেটি মানায়, ঠিক সেটিই সেথানে দেওয়া আছে। আহা, কি সৌন্দর্য্যজ্ঞান! প্রকৃতি, এ সৌন্দর্য্যজ্ঞান তুমি কোথায় পাইলে!!

এই সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ভারতের প্রাচীনকালের কত কথা মনে উঠিত। হিমালয়ে ঋষি মুনিগণ পরমসুন্দরের ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন। আর এখন আমরা সেই ঋষি মুনিগণেরই বংশধর. এখানে আমাদের বিলাস-বাসনা. আমোদ-প্রমোদ চরিতার্থ করিবার জন্য দেহের লাবণ্য ও কান্তি বাড়াইবার জন্য আসিতেছি! আমাদের একি অধঃপতন হইয়াছে!

প্রাচীনকালের কত রাজা বার্দ্ধক্যের প্রাক্কালে সাংসারাশ্রম হইতে বিদায় লইয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্মপালন জন্য যে হিমালয়ে আসিতেন, সেই হিমালয় এখন নবীন রাজগণের বিলাস-নগরী হইয়াছে! রাজগণের বৃহৎ প্রাসাদ এখন তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে! কত রাজা ধনী ইংরাজগণের আমোদের জন্য কত অর্থ-ব্যয় করিতেছেন, ওদিকে তাঁহার কত দরিদ্র প্রজা অন্নাভাবে মরিতেছে, সেদিকে দৃষ্টি নাই। যে দেশে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং" এই মহোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই দেশের একি ঘোর দুর্গতি!

একদিন দিদি (বড় ননদ) বলিলেন, "যদি হিমালয়ের আরণ্য-সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, বার্চ্চ হিলে চল"। এ কথায় বালক বালিকারাও যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্থির হইল, একদিন বালক বালিকাদিগকে লইয়া যাওয়া হইবে। দিদি তাঁহার কোন কোন বন্ধুকেও জানাইলেন। তাঁহারাও সন্তানগণ সহ যাইতে প্রস্তুত হইলেন। নিরূপিত দিনে দিদি জলযোগের আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া, শিশুগণের জন্য একখানি রিক্স ভাড়া করিয়া এই বৃহৎ দলটি লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাদের সঙ্গী ছিলেন।

বোধ হয়, ঘন্টাখানেক হাঁটিয়া আমরা বার্চ্চহিলে পঁহুছিলাম। বেশি সময় ছিল না, তাই আর সেথানে বেড়ান হইল

না; বালক বালিকারা জলযোগান্তে অল্পক্ষণ খেলা করিয়া লইল। আমরাও সেই সময়টুকু পাহাড়ের শোভা দেখিয়া লইলাম। কি পবিত্র সুন্দর স্থান! এখানে দাঁড়াইলে নিজেকে কত ক্ষুদ্র মনে হয়! আমাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অহঙ্কার লজ্জা পায়। যে ভূমা মহান্ দেবতা, এই হিমালয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার চরণে প্রাণ স্বতই নত হয়।

ভক্তিভাজন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্থানকালের উপযোগী গম্ভীর ভাবপূর্ণ, অতি সুন্দর উপাসনা করিলেন। "অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়" এই সঙ্গীতটি গীত হইল। উপাসনান্তে সন্ধ্যা সমাগত প্রায় দেখিয়া আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আর একদিন বার্চ্চ হিলে যাইবার বড় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সুবিধা হইল না। আমরা একদিন ভুটীয়া মন্দির দেখিতে গেলাম। একটি ভুটিয়া পুরোহিত মন্দির-দ্বার খুলিয়া আমাদিগকে দেখাইল। অনেকগুলি গ্রন্থ, মন্দিরে রক্ষিত আছে। বোধ হইল, এগুলি কেহ পাঠ করে না। শিখদিগের গ্রন্থসকলের ন্যায় এগুলিরও পূজা হয়।

মহাত্মা বুদ্ধ যে নির্ব্বাণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া বিষাদিত অন্তরে গৃহে ফিরিলাম।

দিদি আমাদিগকে লইয়া একদিন আলুবাড়ী শ্লিপ দেখিতে গেলেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে, প্রবল বর্ষাপাতে পাহাড়ের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই স্থানে একটী ভুটিয়া বস্তি ছিল। চারিশত ভুটিয়া পরিবার, ইহাতে বাস করিত। সেই ভীষণ বর্ষা রাত্রিকালে পাহাড় ভাঙ্গিয়া, এই চারিশত পরিবার ও তাহাদের বাসগৃহ যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও পরদিন প্রাতে কেহ দেখিতে পায় নাই। পাহাড়ের অপর অংশে ইংরেজেরা বাস করিতেন। সে অংশও ভাঙ্গিয়া কত ইংরাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। একজন ইংরাজ পাদ্রী ছয়টি সন্তানকে এখানে রাখিয়া সস্ত্রীক কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেই প্রলয়কালীন রাত্রে ছয়টি সন্তানই বিনষ্ট হইয়াছিল। দিদি তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণনাশক্তি দ্বারা এমন করুণ ভাবে ঐ সব কাহিনী বর্ণন করিতে লাগিলেন যে মনে হইল যেন ঐ শোকাবহ ঘটনা আমাদের সম্মুখে ঘটিতেছে। সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই স্থানে বৃহৎ প্রস্তর সকল পর্ব্বত গাত্র হইতে স্খলিত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সেই ভীষণ প্রলয়-রাত্রির স্মৃতি ও তাহার শোচনীয় নিদর্শন, আমাদিগকে "ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং" দেবতাকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল।

আমি ১০।১৫ দিনের মধ্যে দার্জ্জিলিঙ্গ দেখিয়া লইয়া কার্সিয়ঙ্গে ফিরিয়া আসিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু দিদি ও তাঁহার সন্তানগণের স্নেহাদর আমাকে বন্দী

করিয়া রাখিল। খোকার তো কথাই নাই। তাহার ভাই-বোন হয় নাই। এখানে এতগুলি ভাই বোন পাইয়া সে আর কলিকাতা যাইতেও চাহিত না। দিদির যত্নে আমার শরীর সুস্থ সবল হইয়া উঠিল। প্রতিদিন ভ্রমণ করিয়া, হিমালয়ের নব নব সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতাম, তাহা এখন স্মরণ করিতেও আনন্দ হইতেছে।

মাসাধিক কাল দার্জ্জিলিঙ্গে কাটাইয়া কাসিয়ঙ্গে ফিরিলাম। বিদায় কালে দিদি ও তাঁহার সন্তানগণের বিষন্ন ভাব ও আমাদিগকে আরও কিছুদিন ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যাকুলতা আমাকে কাতর করিয়া তুলিল। খোকাও নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে আমার সঙ্গী হইল।

কাসিয়ঙ্গে ফিরিয়া দেখিলাম, আমার একটী দেবর ও একটী ননদ আসিয়াছেন। ইঁহারা আমার শ্বশুর মহাশয়ের সোদর-প্রতিম বন্ধুদ্বয়ের সন্তান। উভয়েই আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট। ছোট ভাই-বোনের মত ইহাঁদিগকে পাইয়া বড় আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। এই ননদটী ও আমি একত্রে প্রায়ই বেড়াইতে যাইতাম। দেবরটীও এক এক দিন ভ্রমণকালে আমাদের সঙ্গী হইতেন। ভ্রমণকালে দেখিতাম, কত ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণী কুলু কুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছে। এই নির্ঝরিণীগুলি দেখিয়া নিজের জীবনের কথা মনে হইত। ভাবিতাম, নির্ঝরিণি! তুমি এত ক্ষুদ্র, আমিও ক্ষুদ্র, কিন্তু তোমার মত কেন আমি জীবনের কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারি না? তুমি কিসের বলে এত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া যাও? তোমাকে দেখিয়া কি আমি কিছুই শিখিব না?

একদিন ডাউহিল দেখিতে গেলাম। এই পাহাড়টীর সর্ব্বোচ্চ শিখর, আমরা যেখানে থাকি—সেখান হইতে বোধ হয় আড়াই হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। এই শিখরে উঠিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ দেখিয়া দেবর বলিলেন, "আপনি কি এত উর্দ্ধে উঠিতে পারিবেন?" আমি বলিলাম, "খুব সম্ভব পারিব।" আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ডাউহিলের পাদদেশে রোমান ক্যাথলিক্ বালিকাগণের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল আছে। বোধ হয় শতাধিক বালিকা এখানে বাস করে। অনেকগুলি চিরকুমারী এখানে শিক্ষয়িত্রী-রূপে রহিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় জগতে ধর্ম্মার্থে যেরূপ অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও সর্ব্বোপরি আত্মোৎসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল। অনেকগুলি ছোট ছোট বালিকা স্কুলসংলগ্ন ভূমিতে খেলা করিতেছিল। তাহাদিগের উৎসাহ ও প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, ইহারা খুব সুখে আছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্কা বালিকারা শিক্ষয়িত্রীগণের সহিত বেড়াইতে বাহির হইতেছে দেখিলাম। আমরা চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতারোহণ কষ্টকর, কিন্তু ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার এত

আনন্দ, এত উৎসাহ হইয়াছিল যে, আমার কিছুই কষ্টবোধ হইল না। বোধ হয়, হাজার ফুটেরও অধিক ওঠার পর দেবর বলিলেন, "বৌদিদি একবার পশ্চাতে তাকাইয়া দেখুন।" আমি পশ্চাতে চাহিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "একি?" সুদূরস্থিত পক্তমালা যেন আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। কেবল পর্ব্বতের ঘন সুনীল বর্ণ আকাশের সহিত তাহার পার্থক্য সূচনা করিতেছে। সেই পর্ব্বতগাত্র বহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী সকল প্রবাহিতা। অস্তোন্মুখ সূর্য্য-কিরণ সংস্পর্শে ইহার জল উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া এই শোভা দেখিতে লাগিলাম। সাধক কবি রবীন্দ্রনাথের "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে, তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে জাগে, সম্মুখ আকাশে চরাচর লোকে এই অপরূপ আকুল আলোকে, দাঁড়াও হে নাথ! দাঁড়াও হে" এই সঙ্গীতটি আমার প্রাণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্রমে আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। এই পথটী অতি রমণীয়। পুষ্পিত বকুল বৃক্ষের সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত। স্বর্ণাভ-ফল-শোভিত ষ্ট্রবেরী বৃক্ষগুলি এই পথের শোভা আরও বাড়াইতেছে। একটী নির্ঝরিণীর উৎপত্তি স্থান দেখিতে পাইয়া আমি ঐ স্থানে অবতরণ করিলাম। কত নদী কত নির্ঝরিণী দেখিয়াছি, তাহাদের উৎপত্তিস্থান তো দেখি নাই। তাই আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঐ স্থানে নামিয়া একখানি প্রস্তরে বসিলাম। নির্ম্মল জলরাশি অবিরত উৎসারিত হইতেছে। অবিরত বহিয়া, কত দেশ কত জনপদকে উর্ব্বরা করিয়া, সাগরে মিশিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিতেছে। ভাবিতে লাগিলাম, আমার জীবনের প্রেম-উৎস কি এইরূপে বহিয়া প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্রে মিশিবে না!

গিরিশিখরে পৌঁছিয়া দেখিলাম সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। এখন বাসায় ফিরিবার চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল। ত্বরিতপদে অবতরণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বতে আরোহণ যেরূপ কষ্টকর, অবরোহণ তেমনি সহজ। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা নামিয়া পড়িলাম। নামিতে নামিতে দেখি চন্দ্রালোকে চারিদিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। কত ইংরাজ-রমণী, কেহবা সঙ্গিনী সহ, কেহবা স্বামী সহ ভ্রমণে বাহির হইতেছেন। মনে হইল, ইহাঁরাই জীবন উপভোগ করিতে জানেন। দেবর বলিলেন, "আপনি কি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন?" আমি বলিলাম, "একটুও না, এখনও যদি আবার এই ডাউহিলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিতে ও নামিতে হয়, তাহাও স্বচ্ছন্দে পারিব?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আপনার দেহে মহারাষ্ট্র-শোণিত আছে দেখিতেছি।"

দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে কার্সিয়ঙ্গে ফিরিবার ৭/৮ দিন পরেই আমাদের বাড়ীর সকলেই ছিল,—ডায়েরিয়াতে কষ্ট পাইতে

লাগিলেন। কেবল আমি ও খোকা ভাল ছিলাম। সকলেই আহারাদি বিষয়ে খুব সাবধান হইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পূর্ব্বে কথা ছিল আমরা সকলে ১৫ই জুন নাবিব, শ্বশুর মহাশয় ও শ্বাশুড়ীঠাকুরাণী আরও দুইমাস পরে নামিবেন। কিন্তু হিল ডায়েরিয়ার হস্ত হইতে কিছুতেই মুক্ত হইতে না পারাতে স্থির হইল যে, আমরা সকলে ১লা জুন নামিয়া আসিব। শ্বশুর মহাশয় দার্জ্জিলিঙ্গ যাইবেন। সকলেরই মনটা খারাপ হইয়া গেল। খুবই বর্ষা হইতে লাগিল। আর তেমন বেড়ান হইত না।

৩১শে মে উষাকালে আমি উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দেখি, আকাশ অতি নির্ম্মল। উষার লোহিত আভা তুষার-ধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গকে স্বর্ণাভ করিয়া তুলিয়াছে। এই নির্ম্মল প্রশান্ত উষা-কালে, ডাউহিলে গিয়া দেবদেবের আরাধনা করিবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হইয়া উঠিল। আমি আমার ননদকে লইয়া ডাউহিলের দিকে যাত্রা করিলাম। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, জনহীন রাজপথ বাহিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। ডাউহিলের মধ্যস্থলে একটি লৌহনির্ম্মিত বেঞ্চ আছে। সেখানে গিয়া বসিলাম। কি পবিত্র স্থান। এখানে আসিলে সকল প্রকার সংসারিকতা, ক্ষুদ্রতা কোথায় চলিয়া যায়, আমার মত সংসারাসক্তের চিত্তও যেখানে ভগবৎসহবাসের জন্য ব্যাকুল হয়। কিছুক্ষণ বসিয়া আমরা পরম দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিলাম। যখন নামিলাম, দেখি, সদ্য-স্নাতা সুন্দরীর ন্যায়, প্রকৃতিরাণীর সৌন্দর্য্য, বিমল সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিনই আমরা নামিয়া আসিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, হিমাচল! এই দুই মাস তোমার কোলে থাকিয়া যে পরম আনন্দ পাইলাম, তাহা ইহজীবনে ভুলিব না। "গিরি হে! নমিস্থ পদে বিদায় বিদায়।"

আমি।

প্রথম বিধি,—আত্মরক্ষা। শেষ বিধি,—আত্মদান। প্রথমে জড়, তৎপরে চৈতন্য, সর্ব্বশেষে অধ্যাত্ম বিধির প্রকাশ।

আত্মদান করাই পুরুষকারের পরাকাষ্ঠা।

আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার এই যে আত্মা আপনাকে পরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, প্রিয়তমের জন্য, ভগবানের জন্য, নিজেকে দান করিতে পারে। ইহাই আত্মার সফলতা,—পূর্ণতা!

সাদিতে আছে যে,—"হে বুলবুল! তুমি গোলাপের প্রতি তোমার প্রাণের

কি জারি কর? যদি প্রেম শিখিতে চাও, তবে পতঙ্গের নিকট যাও। সে আলোকের জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি একটী কথাও কহিবে না।”

বশ্যতাই স্বাধীনতার উপায়। ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে, ভক্ত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে, ঈশ্বরের মত, ভগবৎ-ইচ্ছার অধীন করেন। ভক্ত ভগবৎ—অধীন হইলেই, ভগবান্ ভক্তাধীন হন।

স্ত্রী যদি স্বামীকে নিজের করতলস্থ করিতে চাহেন, তবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর ইচ্ছাধীন করেন। ইহাই বশীকরণ মন্ত্র। প্রত্যেক স্বামী স্ত্রী যেন ইহা শিক্ষা করেন।

নিজের মনে খুব বড় হইলে, মানুষ অধ্যাত্ম হিসাবে ছোট হইয়া পড়ে। নিজেকে গুরু করিলে, আমি লঘু হই।

যতই আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, মাৎসর্য্যরূপ লগেজ ত্যাগ করিয়া, আমার আত্মাকে লঘু করি, ততই আমি প্রকৃতপক্ষে গুরু হই।

কামাদি ছয়টার ভারে ভারাক্রান্ত হইলে আমি লঘু হই! আমি যতই সংসারের পুঁটুলি বাঁধি, ততই ধর্ম্মের সংস্থান হারাইয়া ফেলি। আমি যতই সংসারে কৃতী-কুশল হইতে যাই, ততই ধর্ম্মের ভাব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমশঃ বাক্‌সর্ব্বস্ব ধর্ম্মবীর হইয়া পড়ি। আমি সংসার করি ও ধর্ম্মেও মন রাখি, ইহা হয়। কিন্তু ধর্ম্ম করি এবং সংসারেও মন রাখি, ইহা হয় না।

আমি ধর্ম্মটাকে চাট্‌নি ও সংসারটাকে ভোজ করিয়া ফেলিয়াছি। বস্তুতঃ ধর্ম্মই ভক্তের ভক্ষ্য পানীয় হওয়া উচিত।

ধর্ম্ম বক্তব্য নহে,—বক্তৃতা, কবিতা, প্রবন্ধ-রচনার বিষয় নহে। উহা কর্ত্তব্য! উহা নিত্যসাধ্য,—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বিষয়। উহা চিন্তা, ভাবনা, আস্বাদন, ধ্যান ও স্বপ্নের বিষয়! উহাতে আত্মা সদা সর্ব্বদা সিক্ত হইয়া থাকে।

যতই আমাকে সংসারে বাঁচাইয়া চলি, ততই আমি মরি। যতই কাম, ক্রোধ, লোভাদি সংসারের জীবনের মৃত্যু হয়, ততই আমি বাঁচি, অধ্যাত্ম জীবনের পূর্ণতা ও উন্নতি লাভ করি। যতই কাম, মোহ, মদ, নষ্ট হয়, ততই আমি বাঁচি,—রক্ষা পাই,—ততই আত্মা জীবন্ত, বলীয়ান্, সতেজ, ঐশ্বর্য্যবান্ হয়। যতই আত্মা সতেজ, বলীয়ান্ হয়, আমি ততই মানুষ হই।

ছাগল কুক্কুরের মত জীবন যাপন করিলে, আমি মানুষ হইতে পারি না। মানুষ হইতে হইলে, মানুষের মত হইতে হইলে, মানুষের মত চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা ও কার্য্য করা চাই।

মহৎ হইতে হইলে, নীচ ও পশুজীবন যাপন করিলে চলিবে না। মহৎ হইতে হইলে, মহতের মত থাকিতে, ভাবিতে, চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছা, ও কার্য্য করিতে হইবে। তবেই মহৎ হওয়া যায়। মহৎ হইবার অন্য পন্থা নাই, অন্য উপায় নাই, অন্য কৌশল নাই! পূজনীয় পিতা পিতা-

মহ দেব ও মহাত্মাগণের জীবনী অবলোকন করিয়া, ইহাই দেখিতে পাই।

আমি বানর হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত দেখিয়াই অভিব্যক্তিবাদ সমাপ্ত করি না।

আমি দেখি যে, আনন্দস্বরূপে আত্মার উৎপত্তি। আনন্দেই আমার স্থিতি। শেষ হইয়া গেলে, সেই আনন্দসাগরেই ভাসি, থাকি, লীন হই।

আমি ইচ্ছা করিলে পশু, মানুষ ও দেবতা, এই তিনই হইতে পারি কারণ, উহারা সেই এক চৈতন্যেরই বিভিন্ন ক্রমের বিকাশমাত্র। তাহা হইলেও, আমরা বানরের বংশাবলী ভাবিয়া, ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের মত নিজেকে বন্য মনে করিতে পারি না।

আমি অমৃতের সন্তান হইয়া, বানরের বংশোদ্ভব মনে করিব কেমনে! তাহা হইলে নিজেও বাঁদর হই, ব্রহ্মকেও বাঁদর বানাই! আমি ব্রহ্মপুত্র,' ব্রহ্মকুমার, অমৃতের সন্তান! আমি অমর! অমৃতের পথে চলিয়াছি! ইহাই ভারতের চিরপ্রাচীন শিক্ষা।

আমি ডারউইনের মত বিজ্ঞানান্ধ হইয়া নিজেকে বানরের বংশধর মনে করিয়া, নিজেকে ও ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিতে চাহি না। পুণ্যভূমি ভারত! তুমি চিরদিনই ব্রহ্মের লীলাভূমি,—চৈতন্যের লীলাভূমি,—অধ্যাত্মক্ষেত্র—পুণ্যধাম!

আমি যখন স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বিষয়, বৈভব, মান, সম্ভ্রম লইয়া ব্যস্ত থাকি, তখন অধ্যাত্ম তত্ত্ব মানসচক্ষের সম্মুখে প্রকাশ পায় না। তখন আত্মা, পরমাত্মা, জীবন, মরণ, ইহ পরকাল আর ততটা চিত্তকে আকৃষ্ট করে না। সংসারের কার্য্য,—সংসারের উন্নত,—সংসারের আমোদ প্রমোদ ছাড়া অন্য বিষয় ভাবিবার সময় ও সুযোগ পাই না।

কেবল পাই না, তাহা নহে। পাইলেও তাহা ভাল লাগে না।

দেহটা ভাঙ্গিয়া বল ও যৌবনের গৌরব ঘুচিলে, বন্ধুশূন্য—শান্তি ও সুখশূন্য হইলে, অর্থহীন,বিষয়কার্য্যহীন হইয়া ভাবিবার;ও চিন্তা করিবার সময় পাই।

সাঁপে বর। যতই সংসারের দিকটা ভাঙ্গিয়া যায়, ততই ধর্ম্মের দিকটা পড়ে।

রোগ, শোক, পাপতাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য, লজ্জা, অবমানন। যতই ভোগ করি, ততই মনে হয়, "বেশ হইয়াছে"—"যেমনিকার তেমনি।"

জীবনের বৃথা আড়ম্বরগুলোকে লইয়া সত্যকে, প্রকৃত ধনকে, জীবনকে ভুলে থাকি বলিয়া, ওগুলিকে আমার নিকট হইতে কঠিন আঘাতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। শেষে যাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাদিগকে এত আঁকড়াইয়া থাকা কেন? ক্রমে ক্রমে ছাড়াই তো ভাল।

যাহা একবারেই সম্পূর্ণভাবে ছাড়িতে হইবে, তাহা ক্রমশঃ একে একে ছাড়াইয়া লওয়াই তো বন্ধুর কার্য্য

আমার আত্মার প্রকৃত সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

যাহা সঙ্গে লইয়া আসি নাই, ও লইয়া যাইতে পারিব না, তাহা ছাড়িয়া গেলেই বা এত কাঁদি কেন গো? উহাই তো মায়া, মোহ! এত হাসাহাসি, কাঁদাকাদি, যেন স্বপনের!

যেই জাগিয়া উঠি, অম্‌নি মনে হয়, —অকারণ কাঁদিয়াছি।

একবার একবার জাগি, আবার আমি যেন ঘুমের ঘোরে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এত বোঝাবুঝি করিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জীবনে, কার্য্যে, কতদূর আমার জ্ঞান দাঁড়ায় বলা যায় না।

এখন মনে হয়, এই গুলোর জন্যই এত দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি করিতেছিলাম!

কিন্তু যেই দেখি যে এগুলো আমার নয়,—তাঁর—সৃষ্টিকর্ত্তার, তখন আর এক ভাব মনে উদয় হয়। তখন আর সে বলের ও যৌবনের গৌরব নাই,—আর সে ধনের ও বিষয়-উন্নতির অহঙ্কার নাই। আর সে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, আত্মীয় লইয়া, সুখসম্ভোগ করিবার কল্পনা ও চেষ্টা নাই। তখন আমি তাঁহার সংসারের সেবক, ভৃত্য, দাসানুদাস।

সংসারে যখন তাঁহারে দেখি, তখন উহাই ধর্ম্মক্ষেত্র, স্বর্গধাম! সংসার যখন আমার করিয়া ফেলি, তখন উহা দুর্গন্ধময়, নরকসমান!

সংসারটা যখন তাঁহার করিয়া ফেলি, তখন আমি লগেজশূন্য, হাল্কা, একা!

আমি একাকী না হইলে, ভাল করিয়া আমির কথা ভাবা হয় না। আমি একাকী ইহা অনুভব করিলে, ভাবি, কেন আর বৃথা পূর্ব্ববৎ কালের অপব্যবহার করি? তখনই মনে হয়, আমি কি? আমার কি হবে? আমি কোথা হইতে আসিয়াছি,—কোথায় যাইতেছি, কোথায় আছি, কোথায় যাইব? কে আমার? আমার নহে কে?

তখন এই সব ভাবিয়া সারা হই, আকুল হই। ভাবিতে ভাবিতে, আমি দেহহীন, অঙ্গহীন, অর্থহীন, বস্ত্রহীন হইয়া পড়ি। ভাবিতে ভাবিতে, আমি মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ, আশ্রয়হীন, ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ককণার মত, অস্তিত্ববিন্দুতে পরিণত হই। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

সেখ সাদি।

১। পারস্য দেশের কোনও রাজার একজন ক্রীতদাস পলায়ন করিয়াছিল। কতিপয় কর্ম্মচারী তাহার অনুধাবন করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিল। তাহার উপর

রাজমন্ত্রীর বিদ্বেষ ছিল। তিনি তাহার প্রাণবধের পরামর্শ দিলেন। দাস রাজার সম্মুখে ভূমিতে মস্তক রাখিয়া বলিল ;—

তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য নাহি অন্যগতি,
তুমিই বিচারপতি, বৃথা স্তব স্তুতি।

আমি এতকাল আপনার সংসারে পরিপোষিত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা নয় যে ঈশ্বর যখন বিচার করিবেন তখন আপনি আমার রক্তপাতের জন্য দায়ী হইবেন। বিনা অপরাধে আমার প্রাণবধ করিতে ইচ্ছা করেন করুন, কিন্তু শাস্ত্র অনুমোদিত হইলেই ভাল। কবর হইতে উত্থানের দিন যেন আপনার শাস্তি না হয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাস্ত্রে কি বলে তাহা ঠিক বুঝিব কেমন করে।" সে বলিল, "আমাকে এই মন্ত্রীকে বধ করিতে অনুমতি প্রদান করুন ; পরে এই অপরাধের জন্য আমার প্রাণবধের আজ্ঞা দিবেন, তাহা হইলেই আপনার কোন দোষ থাকিবে না।" রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি মত! মন্ত্রী বলিলেন, "প্রভো! আপনার পিতার প্রেতাত্মার মঙ্গল কামনায়, তাঁহার কবরের সমীপে এই দুষ্ট বাচালটাকে স্বাধীনতা দান করুন, তাহা হইলে সে আর আমাকে বিপদে ফেলিতে পারিবে না। এ বিষয়ে আমারই দোষ, আমি পণ্ডিতদিগের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তাঁহারা বলেন :—

খিদায় যাহার হস্ত ক্ষিপ্র অতিশয়,
যুঝিলে তাহার সহ মরণ নিশ্চয়।
শত্রু প্রতি শরক্ষেপ করিবার আগে
দেখ যেন তার বাণ তোমাকে না লাগে।

২। বুয়ুন দেশের রাজার একজন পরম দয়ালু ও উদার-স্বভাব মন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষে সকলের সহিত শিষ্টাচার ও পরোক্ষে তাহাদের প্রশংসা করিতেন। দৈবগুণে একদা কোন কর্ম্মের জন্য তিনি রাজার বিরাগভাজন হইলেন। সুলতান তাঁহার অর্থদণ্ডের ও অর্থদণ্ড না দিতে পারিলে, কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। প্রহরীরা তদীয় পূর্ব্বকৃত উপকার বিস্মৃত হয় নাই, এখন তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অবসর পাইল। যতদিন তিনি তাহাদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তাহারা তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিল ও তাঁহাকে কোন কষ্ট দিল না কিম্বা কটু কথা বলিল না।

অসাক্ষাতে শত্রু যদি তব নিন্দা করে,
প্রশংসা করিবে তার মুখের উপরে।
নিন্দুকের কটু কথা না শুনিতে চাও,
পূর্ব্ব হতে মুখ তার মিষ্টান্নে ভরাও।

মন্ত্রী কিয়ৎ পরিমাণে অর্থদণ্ড দিলেন ও অবশিষ্ট অর্থের জন্য কারাবদ্ধ হইলেন। নিকটবর্ত্তী কোন রাজা বিশ্বস্ত দূত-মুখে তাঁহাকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন "আপনি যে কি উন্নত স্বভাবের লোক আপনার রাজা তাহা বুঝিতে পারেন নাই সেজন্য আপনার এত অপমান। ঈশ্বর করুন, আপনি শীঘ্র কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর যা

আপনি দয়া করিয়া আমাদের রাজ্যে আসেন, আমরা পরম আপ্যায়িত হইব ও আপনার মনোবাঞ্ছা যথাসাধ্য পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব। দেশের অমাত্যগণ আপনাকে দেখিবার জন্য সকলে উৎসুক এবং আপনার প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় রহিলেন"। পত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রীর বিপদের আশঙ্কা হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পত্রের পৃষ্ঠে এমন ভাবে উত্তর লিখিলেন, যে, প্রকাশ হইলে কোন বিপদ্ ঘটিতে না পারে। রাজার একজন কর্ম্মচারী, এই কথা জানিতে পারিয়া রাজাকে বলিল, "আপনি যাহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন, সে এখন নিকটবর্ত্তী অপর রাজার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া এই ঘটনার প্রমাণ চাহিলেন; তাহাতে কর্ম্মচারীরা দূতকে ধৃত করিয়া আনিল ও তাঁহার নিকটে যে পত্র ছিল তাহা পাঠ করিল। পত্রের মর্ম্ম এই,—"আপনি যে সকল গুণের কথা বলিয়াছেন, তাহা এ দাসের কিছুই নাই। আমাকে যে উচ্চপদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমি স্বীকার করিতে নিতান্ত অক্ষম, কারণ, আমি যে রাজসংসারে এতদিন প্রতিপালিত হইয়াছি এখন সামান্য মনোমালিন্য হইয়াছে বলিয়া সেই হিতকারী রাজার প্রতি কৃতঘ্ন হইতে পারিব না। কারণ লোকে বলে :—

যে তোমার দিন দিন করে উপকার,
ক্ষম তারে যদি করে মন্দ একবার।

রাজা মন্ত্রীর কৃতজ্ঞতায় বড় প্রীত হইলেন, তাঁহাকে বহু অর্থ ও সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন ও এই বলিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন;— "আমি অন্যায় করিয়াছি ও অকারণে তোমায় দণ্ড দিয়াছি"। মন্ত্রী বলিলেন,— "সুলতান! এ দাসে আপনার কোন অপরাধ নাই, ভগবানের ইচ্ছা যে আমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে; আপনার হাতে যে দণ্ড পাইয়াছি তাহা মঙ্গলকর, কারণ আপনার প্রসন্নতা ও অনুগ্রহ আমি বহুকাল ভোগ করিতেছি। পণ্ডিতেরা বলেন :—

কষ্ট যদি পাও, দুঃখ করোনা কখন
জীব হতে সুখ দুঃখ না হয় ঘটন,
শত্রু মিত্র ঈশ্বরই করেন প্রদান,
করেন সকল হৃদে তিনি অধিষ্ঠান;
ধনু হতে বাণ হয় যদিও মোচন
ধনুর্দ্ধর কিন্তু তার কেবল কারণ।

৩। আরব দেশের কোনও রাজা তদীয় কোষাধ্যক্ষকে কোনও কর্ম্মচারির বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দিতে আদেশ করিয়া বলিলেন;—দেখ, এই ব্যক্তি সর্ব্বদা সভায় উপস্থিত থাকে এবং যখন যে আজ্ঞা দেওয়া যায়, সে তদ্দণ্ডে তাহা পালন করে; অন্য ভৃত্যেরা আমোদ আহ্লাদে রত থাকে ও নিজ নিজ কর্ম্ম অবহেলা করে। একজন বিজ্ঞ লোক ইহা শুনিয়া বলিলেন;—ঈশ্বরের দরবার এইরূপই উন্নত হইয়া থাকে;

ভৃত্য যদি দুই দিন রাজসেবা করে,
তৃতীয় দিবসে তাঁর সুনয়নে পড়ে।
সেরূপ ঈশ্বরে ডাকে যে জন কাতরে,

হতাশে সে কভু নাহি ফিরে তাঁর দ্বারে।
সে সুখী ঈশ্বর আজ্ঞা যে করে পালন,
অবাধ্য সন্তান দুঃখী ত্যাজ্য সর্ব্বক্ষণ ;
যাহার সর্ব্বাঙ্গে আছে সত্যের লক্ষণ,
ঈশ্বরের দ্বারে শির সে করে স্থাপন।

৪। একজন ধার্ম্মিক রাত্রিতে পাঁচ সের মাংস ভোজন করিয়া পরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃকালের পূর্ব্বে সমস্ত কোরাণ পড়িয়া ফেলিতেন। কোনও সাধু এই কথা শুনিয়া বলিলেন :—সে যদি আধ খানি রুটি আহার করিয়া নিদ্রা যাইত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অনেক ভাল হইত।

গলায় গলায় ঠেসে কর যে আহার,
সে কারণ কোন জ্ঞান জন্মে না তোমার ;
জ্ঞানালোক যদি চাও করিতে অর্জ্জন,
সাবধানে পরিমিত করিবে ভোজন।

৫। আমি একদিন একদল যাত্রীর সহিত সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়া নিশাবসানে কোনও অরণ্যের প্রান্তভাগে আসিয়া পৌছিলাম ও তদ্দণ্ডে সকলে নিদ্রা যাইলাম। আমাদের সঙ্গে একজন ক্ষিপ্তপ্রায় লোক ছিল। সে ব্যক্তি ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়া চিৎকার পূর্ব্বক বনাভিমুখে গমন করিল। পরদিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এরূপ ব্যবহার কেন করিয়াছিল। সে বলিল, "আমি কুঞ্জবন হইতে ও পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে বিহঙ্গমকুলের কল কল নিনাদ, জলাশয় হইতে ভেকের আনন্দধ্বনি এবং গভীর অরণ্য হইতে নানা জাতীয় হিংস্র-জন্তর তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া মনে করিলাম যখন সকল প্রাণী নিজ নিজ স্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, তখন আমি নিদ্রিত থাকিলে আমার মানবজন্মের কলঙ্ক হইবে।"

প্রভাতে পাখীর গান, শুনে মুগ্ধ মনপ্রাণ,
হইলাম আত্মহারা কি জানি কি মনে,
ডাকি বন্ধু মোরে কয়, এ নাই বিশ্বাস হয়,
এত মত্ত হয় লোক পাখিদের গানে!
আমি বলিলাম ভাই! কিছু অসম্ভব নাই,
পাখী হয়ে ঈশ্বরের যদি গুণ গায়
কেমনে মানব তবে, শুনিয়া নীরবে রবে?
মাতিয়া উঠিয়া যোগ দিবে নাহি তায়?

৬। আমি একবার কতকগুলি শান্ত-প্রকৃতি ও ধর্ম্মপরায়ণ লোকের সহিত হিজাজ যাইতেছিলাম। তাহারা মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের নাম গাইতেছিল। একজন ফকিরের তাহা ভাল লাগিল না। সে ব্যক্তি দরবেশদিগের অবস্থা সম্যক্ বুঝিত না, সুতরাং তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে তাহার অনেক সন্দেহ ছিল। ক্রমে আমরা একটী ভাল বনে প্রবেশ করিলাম। সেখানে কৃষ্ণবর্ণ একটী আরব যুবক উপস্থিত হইয়া এমন মধুরস্বরে গাহিতে লাগিল যে উড্ডীয়মান বিহঙ্গম মুগ্ধ হইয়া সেই বনের বৃক্ষশাখায় আসিয়া বসিল। আমি দেখিলাম,—সেই ফকিরের উষ্ট্র পর্য্যন্ত উন্মত্ত হইয়া এমন নৃত্য করিতে লাগিল যে ফকির ভূতলে পড়িয়া গেল। আমি বলিলাম,—"দেখজি! ভগবানের নামে পশু, পক্ষি, বিহ্বল হইল, কিন্তু তোমার ত কোন ভাবান্তর হইল না।

জান কি প্রভাতে পাখি কি গান গাহিল,
কি সুধা আমার কাণে আসিয়া ঢালিল।
কিরূপ মানব তুমি বুঝিতে না পারি,
এতকালে নাহি হ'লে প্রেমের ভিকারি।
গান শুনি হল হর্ষ উটের পরম
কিন্তু নিরানন্দ তুমি পশুর অধম।

লবঙ্গলতিকা দোলে পবন হিল্লোলে
কঠিন পাষাণ কিন্তু তাহাতে না টলে।
যে দিকে নয়ন যায়, সদে বিভু গুণ গায়
প্রাণে যার সুর বাঁধা সে বুঝিতে পারে,
গোলাপে বুলবুল বসে, শুধু কি মহিমা ঘোষে
কাঁটায় কাঁটায় লতা, পুজে প্রেম ভরে।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আবার ভাল কাজ যেমন মানুষের লাবণ্য বাড়ায়, মন্দ কাজ তেমনি লোকের চেহারা খারাপ করিয়া দেয়। নিঃস্বার্থ পরোপকারই উহার সাধককে ঐরূপ সুন্দর করিতে পারে। যে কাজ আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ অপরের জন্য দেওয়া হয়, ও যাহা আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ আনন্দে লওয়া হয়—সেই কাজই জীবনের প্রকৃত সাধনা। সমস্ত জগতে উহার প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। যাহারা মুক্তহস্তে দান করে, তাহারা সেরূপ অসংখ্য প্রকারে পুরস্কার পায়। যে অন্যের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন দেয়, তার জন্য অপরেও আত্ম সঁপিতে উদ্যত। অনেক মহিলা নিজের পরিচ্ছদ ও বেশ ভূষার জন্য কত পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগকে দেখিতেও বেশ পরিপাটী হয়। কিন্তু নিজ সজ্জায় দুই ঘন্টা না কাটাইয়া উহার অর্দ্ধেক সময়ও যদি তাঁহারা কোন মাতৃহীনা বালিকার সেবায়, কিম্বা দরিদ্র সন্তানের বই কাপড় সেলাই প্রভৃতির সাহায্য করেন তাহা হইলে উহা তাঁহাদের বাহিক পরিপাটীর সঙ্গে আন্তরিক মহত্ত্বের পরিচয় দেয়।

অনেক গরীব স্ত্রীলোক জীবিকার জন্য খাটিতে বাধ্য হয়, এক মুটা ভাতের জন্য কত সময় তাহারা দিন রাতি কাজ করে; অবশ্য ওরূপ পরিশ্রমে তাহাদের যে কোন সদ্গুণ দেখা যায় না, তাহা নহে। কিন্তু উহাদ্বারা তাহাদের মহচ্চরিত্রের কোন প্রমাণ দেয় না। আমরা যখন এ কাজটা করিলে ওর ভাল হয়, রাত্রে জিনিষটা পাইলে উহার উপকার হয়' এরূপ ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া কোন সৎকার্য্য করিতে অগ্রসর হই, তখন সেই কার্য্য আমাদিগকে পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া স্বর্গীয় বিশ্বপ্রেমের মহাপ্রাণতার দিকে অগ্রসর করায়।

জীবনকে মহৎ করা যদি মানুষের প্রধান কাজ হইল; তাহা হইলে অন্যের জন্য খাটীয়াও অপরকে সুখী করিবার জন্য

কিছু সময় কাটান প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য স্বরূপ। কিন্তু অন্য লোকের প্রতি আস্থা না লইলে ঐ আনন্দের উপায় কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত অধিক ভাবনার আবশ্যক নাই। আমরা যদি নিজেদের চারিদিকস্থ লোকদিগকে সুখী করিবার আশায় প্রত্যহ আধ ঘণ্টাও কাজ করি, তাহা হইলে আস্থা আপনা হইতেই আসিবে। আমরা সর্ব্বদা নিজের জন্য খাটিলে উহাতে যেমন স্বার্থপরতার বৃদ্ধি করে, এইরূপ অপরের নিমিত্ত একবার আত্মোৎসর্গ করিতে আরম্ভ করিলে উহা-দ্বারা তেমনি সহজে আমাদিগকে অপরের প্রতি প্রেম শিক্ষা দেয়। আমাদের প্রতি যাঁহারা দয়ালু ও স্নেহময়ী তাঁহাদের অপেক্ষা যাহাদের উপর আমরা দয়াবর্ষণ করি, তাহাদিগকে ভালবাসা অধিকতর সম্ভাবনা। এ বাক্য আপাততঃ অসঙ্গত বোধ হইলেও মানবজীবনে উহা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। পরের জন্য শ্রম করা আমাদের জীবনে মহা কবচের মত, উহা আমাদিগকে আলস্য ও স্বার্থপরতার গ্রাস হইতে রক্ষা করে।

ব্যাকুলতা।

বিক্ষিপ্ত-ব্যাকুল হৃদি অতি আন্দোলিত।
নাহি জেনে মোক্ষপথ অতিশয় ভীত॥
প্রবেশ পাবে কি আত্মা ওই শান্তিদেশে?
অথবা বিক্ষিপ্ত হৃদি চলিবেই ভেসে?
লক্ষ্যহারা এ অকূলে চঞ্চল পবনে।
ভাসাইয়া লয় মোরে মায়া মোহ সনে,
বিজন কাননে হায় তমসার রেতে;
কাঁপিতেছে ক্ষীণ দেহ অতি তরাসেতে
দিশাহারা মন ধায়—মরীচিকা পাছে।
ওহে ধ্রুবতারা তুমি এসো অতি কাছে॥
আঁধারে ডুবিছে হায় সমস্ত ভুবন।
তমসাতে সব ঢাকা না জাগে তপন।
সেই যে বরণ্য মূর্ত্তি অতি সঙ্গোপনে।
কালদূত মিলাইল মহা শ্মশানেতে
জোছনা মাখান সেই দেব দেহখানি।
কোথায় লইল কাল বজ্রবাণ হানি?
আকুল পরাণে খুজি সমগ্র ভুবন।
শুধুই যে ব্যথা বাড়ে বিচূর্ণ পরাণ।
গূঢ় ভাবে দংশে সদা অজ্ঞাত বেদনা
নীরব প্রকৃতি শান্ত সুপ্রসন্ন অতি।
ভাবিতেছে কোথা জাগে স্বরগের ভাতি॥
প্রবাসের মোহ গেল সহসা ভাঙ্গিয়া।
হৃদে বিরাজিত তিনি বিস্ময়ে হেরিয়া॥
স্বরগ দুন্দুভি ধ্বনি কানেতে পশিল।
মৃত্যুশূন্য অমরার দ্বার খুলে গেল॥

বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসব।

পরমেশ্বরের অপার করুণায় বামাবোধিনীর অষ্ট চত্বারিংশ বৎসর পূর্ণ হইল। এই শুভদিনের স্মরণার্থ গত ৩২শে ভাদ্র বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে, বামাবোধিনীর হিতৈষী ও হিতৈষিণী কতিপয় মহোদয় ও ভদ্র মহিলা মিলিত হইয়া এক সভার অধিবেশন করেন। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় পরমেশ্বরের নিকট বামাবোধিনীর কল্যাণার্থ বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে মাননীয় শ্রীযুক্তা শরৎ কুমারী দেব লিখিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়।

বিশ্বেশ্বরের কৃপা স্মরণ পূর্ব্বক আজ বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকা-প্রবর্ত্তক সাধু মহাত্মার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে শত শত ধন্যবাদ ও প্রণাম করিয়া তাঁহার সেই মহান্ উদ্দেশ্যের বিষয় পরস্পরে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

তিনি যে নিয়ত কর্ম্মসমুদ্রে ভাসমান থাকিয়াও অবলা জাতির উন্নতি ও কল্যাণ কামনায় এত উপায় উদ্ভাবন ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, ইহার স্থায়িত্বের জন্য সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত ইহা বলা বাহুল্য। বামাবোধিনীর পূর্ব্বাপর সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে নারী জাতির জাতীয়-স্বভাব-সুলভ সতীত্ব, লজ্জা, বিনয় কোমলতাদি আর্য্যভাব যাহাতে চির রক্ষিত ও উজ্জ্বল থাকে, তাহাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল।

রমণীর যে গুণ লইয়া ভারতের গৌরব, বঙ্গগৃহ সুখের ও শান্তিময়, অধিকাংশ ব্যক্তিরই চিত্ত চিরসন্তোষের আলয়, ধর্ম্মনীতি-বিভূষিত, সেই নারীকুল যদি চিরদিন যথাসাধ্য সংযত হইয়া উচ্চভাব রক্ষা করিয়া সংসার ও সন্তান পালনে রত থাকেন, তবে আমাদের দেশে আর এত অভাবের সৃষ্টি হয় না, যদিও কালের প্রবাহ আমাদের প্রকৃতি ভাবান্তরিত করিয়াছে, তথাপি যদি মার্জ্জিতবুদ্ধি হইয়া আত্মদৃষ্টি করিতে পারি, তাহার ফলাফল অবশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, আর আমাদের সন্তানগণের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের স্রোত যে পরিমাণে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন হইতে দৃষ্টি রাখিলে উহাদের সন্তানগণের মধ্যে আর অধিক প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সংসার করিতে পরিবার মধ্যে আরাম ও সুবিধা ব্যতীত অন্য আর কিছুই লইব না, অন্তর্নিহিত ভাবের তারতম্য ঘটিবে না, এইটী যদি মনে মনে প্রতিজ্ঞা থাকে, তবে কি যথাস্থানে থাকিতে পারিব না?

সংসারে কেহ দেখিয়া শেখে, কেহ ঠেকিয়া শেখে, আমরা এখন ঠেকিয়াই

শিখিতেছি। বাঙ্গালী অধিকাংশই দরিদ্র, অবস্থার অতিরিক্ত কার্য্য সম্বন্ধে যদি এখন না দৃষ্টি পড়ে, তবে কালে ভয়ানক অবস্থাই ঘটিবে।

দয়াময় বিধাতা আমাদের অন্তরে বিচারশক্তি, সংযম ও সন্তোষ প্রেরণ করুন, যদ্দ্বারা আমরা গৃহিণীনামের উপযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে পারি।

এই ৪৮ বৎসরে বামাবোধিনী যাহা তাহাই থাকিয়া আপনার কার্য্য করিতেছে, কিন্তু তাহার পাঠিকাগণের গৃহে কত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, কালের স্রোত কতশতরূপে প্রবাহিত হইতেছে।

প্রবন্ধ পাঠের পর, সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে বামাবোধিনীর প্রথম প্রচলন হইতে এই দীর্ঘকাল ইহার কার্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া সভা বন্ধ করেন। তাঁহার মর্ম্ম সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে একটী উৎসাহী ধর্ম্মপ্রাণ যুবক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। সে সময় ব্রাহ্মসমাজের নব উত্থান হয়। সেই সময় কয়েকজন যুবক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, তাঁরা নারী জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করিবেন। সেইজন্য তাঁরা একটী সভা স্থাপন করিয়া অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে যাহাতে নারীজাতীর সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষার সুবিধা হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে শিক্ষালাভার্থ বিবিধ প্রকারে উৎসাহিত করিতেন, বৃত্তি দিতেন, উপহার দিতেন এবং সেই কার্য্যের জন্য বামাবোধিনী নামে একটী মাসিক পত্রিকা স্থাপন করেন। এই যুবকদলের নেতা ছিলেন আমাদের ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়। তাঁহার হাতেই ইহার সকল ভার অর্পিত ছিল এবং সেই সময় হইতেই তিনি সর্ব্বতোভাবে ইহার উন্নতির চেষ্টা করেন। ইঁহারই উদ্যোগে আমাদের গ্রামে প্রথমে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা, বালিকা সংগ্রহ করা, উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করা, প্রভৃতি কার্য্যে তিনিই প্রধান উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলেন।

এই যে নারী জাতির উন্নতির প্রতি দৃষ্টি, ইহা তাঁহার মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল। ইহা কি কম কথা যে প্রায় ৪৮ বৎসর ধরিয়া এক সম্পাদক একটী মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া ইহার এতদূর উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ক্ষেত্র প্রসার করিয়াছিলেন, তাহা এখনও প্রসারিত রহিয়াছে। এ দেশের নারীগণ এ বিষয়ে অগ্রসর না হইলে, তাঁর কার্য্য হস্তে গ্রহণ না করিলে এ দেশের উন্নতির আশা নাই।

এখনও নারীজাতির অনেক উন্নতি বাকী রহিয়াছে, এখন ভগবান্ করুন, ভগিনীগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের কার্য্য হাতে করিয়া লউন।

হে ভগবান্, এই যুবকদল যাঁহারা তখন বালকমাত্র ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি তুমি

কি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছিলে যে সেই কৃপা-বলে তাঁহারা নারীজাতির উন্নতির দিকে নিয়োজিত হইয়া কি উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখা-ইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের সেই ক্ষমতা মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তোমার সেই সাধু সন্তান কি দৃঢ়তার সহিত জগতের মঙ্গলের জন্য এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ ছিলেন তাহা আদর্শস্থানীয়।

বুদ্ধদেব ও কৃষকের আখ্যায়িকা।

একদা কাশী ভরদ্বাজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার পাঁচশত বলীবর্দ্দ হলে যোজিত করিয়া স্বীয় নিয়মিত অতিথি-সৎকার করিতেছেন। তৎকালে বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। ভর-দ্বাজ বুদ্ধদেবকে বলিলেন,—শ্রমণ! আমি ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজবপন করিয়া তবে ভক্ষণ করি, তুমি সেইরূপ পরিশ্রম না করিয়া ভক্ষণ কর কেন? বুদ্ধদেব বলিলেন, ব্রাহ্মণ! আমিও বীজবপন করি, ক্ষেত্র কর্ষণ করি, তদনন্তর ভক্ষণ করি। ব্রাহ্মণ! কৈ তোমার হলও দেখি না, বলীবর্দ্দও দেখিতে পাই না, তোমাকে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে দেখি নাই, তবে তোমার কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিব? ভগবান্ বলিলেন, আমার সকলই আছে. বিশ্বাস আমার বীজ, অনুতাপ আমার বৃষ্টি, জ্ঞান আমার যুগ (yoke) এবং হল, দীনতা আমার হলদণ্ড, মন আমার প্রগ্রহ, চিন্তা আমার হলফলক ও তাড়নদণ্ড, পরিশ্রম আমার বলীবর্দ্দ, উহা আমাকে নির্ব্বাণরূপ শস্য-পারে লইয়া যায়, সে আর পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমনও করে না এবং শোকও করে না। উপনিষদে এইরূপ ভাব দৃষ্ট হয় যথা,—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ।
বুদ্ধিন্তু সারথিম্বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ বলিয়া জান। বুদ্ধিকে সারথি আর মনকে প্রগ্রহ বলিয়া জ্ঞান কর, ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব, বিষয়সকল উহাদের চলিবার পথ জান। আর ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত যে আত্মা, তিনি ভোক্তা, ইহা মনীষীরা বলেন।

ভূত না মানুষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পথিক চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া সরলা বালিকা ভয়ে ভীতা হইল। কাতর হইয়া কহিল পথিক! তুমি চলিয়া গেলে ভগবান্ সাক্ষী আমার কোন দোষ নাই,

আমি সন্ধ্যা আরতির জন্য ফুল তুলিতে আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে তোমাকে দেখিয়া ভয়সঙ্কুল পথে যাইতে কতই নিষেধ করিলাম। তুমি তাহা গ্রাহ্য করিলে না। যাও, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। পথিকের অশ্ব তখন অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে। পথিক এই ঘোর বিদেশে অপরিচিতা অজ্ঞাত-কুলশীলা একটী বালিকার রূপরাশিতে আপনার সুপবিত্র মনটী হারাইয়া চলিলেন। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। পথের দুই ধারে অরণ্যের প্রারম্ভ ভাগ দৃষ্ট হইতেছে। মধ্যে মধ্যে নব বৃক্ষাবলী কিংশুক, অশোক, পলাশ, পাটল, রঙ্গণ, মাধবীকঙ্কণ, রসাল ও দাড়িম্ব প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর লাল ও শ্বেত ফুল সকল প্রস্ফুটিত হইয়া বায়ুপ্রবাহে সুবাসের উৎস ছড়াইতেছে। শুক, শারী, কপোত, শারিক, শারিকা, কোকিল, কোকিলা ও খঞ্জনদম্পতী, বাবুই চড়াই ইত্যাদি পাখী সকল ডালে ডালে ঘুমাইতেছে। অন্ধকার রজনীতে বায়ু একটু বেগে বহিতেছিল। বায়ুসেবনে পথিকের শরীর শীতল হইল। কিন্তু মন শীতল হইল না।

মস্তকোপরি অযুত রজত-দীপ-খচিত নীলাম্বর; দুই পার্শ্বে গভীর অরণ্য ও বিটপী সকল খদ্যোতমালায় পরিমণ্ডিত হইয়া প্রকৃতির অঙ্গশোভা পরিবর্দ্ধন করিতেছিল। ঘোর মসীময়ী ধরণী প্রকৃতির মুখের অবগুণ্ঠনবৎ শোভা পাইতেছিল, বৃক্ষপল্লবগুলি অন্ধকারের স্তূপ বলিয়া বোধ হইতেছিল। আর কেহ কোথায় নাই। পথিক বেগে অশ্ব চালাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অশ্ব হঠাৎ পদস্খলন হওয়ায় ভূমিতে নিপতিত হইল। প্রত্যুৎপন্নমতি আরোহী এক লম্ফে দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়া শরীর রক্ষা করিলেন। তাঁহার নিকট আলো জ্বালিবার সামগ্রী ছিল। আলো জ্বালিয়া অশ্বের পদ পরীক্ষা করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সহসা গভীরারণ্যের ভিতর একটী নীল রঙ্গের আলো প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইল। ক্ষণকাল পরে বনের ভিতর মৃদু ও অস্ফুট যন্ত্রণাসূচক একটী শব্দ উত্থিত হইল। শব্দটা অলৌকিক, তথাপি মানবকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। পথিক যেমন তেজস্বী তেমনি সাহসী, অতএব তিনি আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। এবং আপনার অসি উন্মোচন পূর্ব্বক, বনের যে দিক্ হইতে আলো আসিতেছিল, সেই দিকে শনৈঃ শনৈঃ চলিতে লাগিলেন।

সহসা বনের অপর দিকে গাঢ়তর লাল রঙ্গের অন্য একটী আলো প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইল। কিন্তু যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, পথিক সেই দিকেই ধাবিত হইতেছিলেন। তাঁহার শরীরে পশুচর্ম্ম নির্ম্মিত একটী পোষাক ছিল, কণ্টকাঘাতে তাহা ছিন্ন ভিন্ন

হইল। অশ্বটীর অঙ্গও ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। তথাপি সেই শিক্ষিত অশ্ব হটিল না। পথিক সাবধানতার সহিত অশ্বচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু গাঢ়তর অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর করিবার উপায় নাই।

পথিক চিন্তা করিতেছেন, সহসা অশ্ব পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। পথিক বিশেষ বিবেচনার সহিত বুঝিলেন, অন্য একটী অশ্ব তাঁহার অশ্বের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। অশ্ব একা চলিতেছে না, অবশ্য অশ্বারোহী আছে। পথিক এইরূপ চিন্তা করিয়া মুক্ত অসি ইতস্ততঃ ঘুরাইতে লাগিলেন। কোনও মাংস খণ্ডের উপর অসি সংবদ্ধ হইলে যেরূপ হয় সেইরূপ হইল। পথিক অসি টানিয়া লইলেন। অনেকক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নাই। পথিক সাবধানতার সহিত লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতরণ করিলেন। একটী পদার্থের উপর তাঁহার পদ পড়িল। সে পদার্থটী অন্য কিছু নহে, একজন মানুষের শবদেহ বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হইল। শঙ্কিত ও ভীতচিত্তে, ক্ষিপ্র হস্তে আলো প্রজ্বলিত করিলেন। একটী বস্ত্রাবৃত নরদেহ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। পথিক বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিলেন। হরি! হরি! এ যে রমণীমূর্ত্তি। এ হত-ভাগিনী কে? পথিক আলোক-সাহায্যে মৃতা রমণীর মুখ ভাল করিয়া দেখিলেন। পথিক সে মুখ চিনিলেন। তাঁহার বীর হৃদয় দ্রব হইল; তিনি অস্পষ্ট চিৎকার করিয়া উঠিলেন। এ আর কেহ নহে, এ পথিকের দগ্ধ হৃদয়-মরুর শান্ত ছায়া-কুঞ্জস্বরূপ একমাত্র জ্যেষ্ঠা ভগ্নী।

(ক্রমশঃ)।

বিজয়া-প্রণাম।

হৃদয়খানি সুধার খনি সদা বিভুর ভাবে,
ছ'টা রিপুর এক্‌টা রেখা পড়েনি স্বভাবে।
নিজের পেটে নাহি অন্ন সে ভাবনা নাই,
পরে খাবে সুখে রবে সদাই ভাবে তাই।
হাড়ি, মুচি, সবাই শুচি মেথর যদি হয়,
দুঃখিত হেরিলে তারে বুকে টেনে লয়।
নিজের মাথা রৌদ্রে পোড়ে, পরকে
ছায়া করে,
পরের চোখে জল দেখ্‌লে আপ্‌নি কেঁদে
মরে।
বুক্‌চেরা-শোণিত-মাখা জবা-বিল্বদলে—
পূজা করে পরাৎপরে পরের পীড়া হ'লে।
মুখ-ইন্দু ঘর্ম্মবিন্দু সুধারসে ভরা,
(সে) মুখের চুমা বোল্‌বো কিমা!
সর্ব্বদুঃখহরা!
মা-মা বোলে ডাক্‌লে ছেলে দুরন্ত শমন,
যমদণ্ড লণ্ডভণ্ড, করে পলায়ন।
মা বলিয়া ডাকি' যারে শাশুড়ী-শ্বশুর—
পিতৃমাতৃপুত্র-শোক করিয়াছে দূর।
অন্ন যার সুধাসার করিয়া ভোজন,

শত শত রোগী কত লভিল জীবন।
সে সিন্দূরে কি মধুর! সে মুখকমল!
শুভ্রাকাশে যেন ভাসে বালার্কমণ্ডল।
সে সব কথা মরম বাথা বোল্‌বো কিবা হায়!
বোল্‌তে গেলে নয়ন-জলে ভাসে সর্ব্বকায়।
মনে করি ভুলে থাকি কাঁদিব না আর,
অমনি উথলি' উঠে নয়নে আসার!
যখনি মা-বাবা প্রাণে উঠেরে! জাগিয়া,
ডাক ছাড়ি ভূমে পড়ি' কাঁদিরে! লুঠিয়া।
সেই হরগৌরী মোর লক্ষ্মীনারায়ণ,
ইহকাল পরকাল তাঁরাই দুজন।
তাঁরা মোর চতুর্ব্বর্গ রতি-মতি-গতি;
তাঁদের শ্রীপদে মোর, বিজয়া-প্রণতি।
সে জননী এ অবনী ছাড়ি দিব্য ধামে,
দিবা সিংহাসনে মোর জনকের বামে।
তাঁদেরি আশীষ সর্ব্ব সিদ্ধির আধার,
তরী মম তরিতে এ ভব-পারাবার।
অমৃত অমৃত সে যে মৃতসঞ্জীবন,
সে মাতা-পিতার নাম মোক্ষের সাধন।
হারাইয়া পিতা-মাতা সে অমূল্য নিধি,
হাহাকারে অন্ধকারে কাঁদি নিরবধি।
হরগৌরী তোমরাই ছিলা এ ভবনে,
ভক্তিভরে সর্ব্ব নরে পূজিত যতনে!
সোণার প্রতিমা ওমা! হে পিতঃ! আমার,
তোমরাই অভাগার আরাধ্যের সার।
যুগল প্রতিমা যবে পূত গঙ্গাজলে—
বিসর্জ্জিনু ভাসিতে ভাসিতে অশ্রুজলে,
তদবধি এ গৃহের মঙ্গল-আলোক—
নিবে গেল, ডুবিল আঁধারে জীবলোক!
বালবৃদ্ধ আচণ্ডল নরনারীগণ
তুলিল ক্রন্দন-রোল ভেদিয়া গগন।
সমস্বরে নারী-নরে দেশবাসিগণ
সর্ব্বলোকে বলে শোকে হ'য়ে নিমগন;
এ দেশের মঙ্গলের ফুরাল রে! আশা,
কে দিবে তাপিতে প্রাণভরা ভালবাসা!
সমগ্র ভারতে আজি বিজয়া-মঙ্গল,
সকলে আনন্দে পূর্ণ শূন্য জল-স্থল।
সমগ্র ভারত আজি আকাশ-অবনি,
জয় মা বিজয়া! বলি' করে জয়ধ্বনি।
আব্রহ্মচণ্ডাল আজি সবি একাকার,
হুলাহুলি-কোলাকুলি আনন্দ অপার।
শোকাশ্রু এ শুভ দিনে ফেলিব না আর,
বিশ্বের আনন্দে আত্মা দিব আপনার।
ভাবিব এ বিশ্ব মম নিজ পরিবার,
পিতা মাতা-ভাই-বন্ধু বিশ্বই আমার।
এস! তবে দেশবাসী! এস কুতূহলে!
এস বামাবোধিনীর পাঠিকা সকলে!
কেহ মাতা, কেহ কন্যা, ভগ্নী হও কেহ,
এ অধমে ঢাল সবে হৃদয়ের স্নেহ!
এ বামাবোধিনী যাঁর হৃদয়ের রক্ত,
ব্রহ্মধামে আজি সেই শ্রেষ্ঠ বিভুভক্ত।
কর তাঁরে কোটি কোটি বিজয়া-প্রণাম,
প্রাতে উঠি ভক্তিভরে কর তাঁর নাম।
বামাবোধিনীর হিতে কর প্রাণ পণ,
ইহাই তাঁহার প্রতি ভক্তির লক্ষণ।

তারাকুমার।

নূতন সংবাদ।

১। রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা—২৭এ সেপ্টেম্বর সিটিকলেজ-গৃহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এইচ, ডি, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

২। এলাহাবাদ শিল্পপ্রদর্শনী—এবার এলাহাবাদ শিল্পপ্রদর্শনীতে দেশীয় রাজা মহারাজদিগের বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য কারু-কার্য্যবিশিষ্ট দ্রব্য প্রদর্শন করিবার জন্য স্বতন্ত্র এক বিভাগ খোলা হইবে। তাহাতে কাশ্মীর, বরোদা, জয়পুর, ভরত-পুর, গোয়ালিয়া, বিকানীর, কোটা, ঝালোয়ার, মালার, কোটালী, কিষেণ-গড়ের রাজগণ আপনাদের দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণ করিবেন।

৩। সম্রাটের স্মৃতি—রাজা এড্ওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষার্থ বাঁকিপুরে এক টাউন-হল নির্ম্মাণ করা হইবে শুনা যাইতেছে।

৪। এলাহাবাদে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত-প্রদর্শনী—যুক্ত প্রদেশের তাঁতিগণের মধ্যে বস্ত্র বয়ন ও সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুতের প্রতিযোগিতা হইবে। ৯ই হইতে ১১ই জানুয়ারী অবধি ঐ প্রতিযোগিতা চলিবে। যাহারা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাদিগকে নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

৫। আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া—সম্প্রতি জাপানে মিঃ টাকাহাস কেন্‌শিন নামক এক জাপানী সকল প্রকার কাষ্ঠ ও বৃক্ষের ত্বক্ যে উৎকৃষ্ট তুলায় পরিণত করা যায়, ইহার এক আশ্চর্য্য প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

৬। সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত সহর।—পাঞ্জাবের ডেরা গাজি খাঁ নামক সহর সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই সহরবাসী বার হাজার লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। বর্ত্তমান সহরের বার মাইল দূরে নূতন সহর নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

শিশির। শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। চট্টগ্রাম শ্রীশ্রীগৌরীশঙ্কর লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানি ক্ষুদ্র পদ্যগ্রন্থ। ছাপা ও কাগজ উত্তম। এ গ্রন্থের অন্তঃসৌন্দর্য্য বড়ই মধুর। যাচ্ঞা, আঁখি-নীর, মিনতি, সাধ, সান্ত্বনা, প্রার্থনা, ঈশ্বরপ্রেম, মাতৃস্নেহ প্রভৃতি এক একটী গাথা যেন নন্দন-পারিজাত-নিষ্ঠ্যূত মকরন্দবিন্দু। প্রতি পদ্যেই গ্রন্থকর্ত্রীর পবিত্র প্রেমমাখা হৃদয়খানি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শ্রীশ্রীগৌরীশঙ্কর লাইব্রেরি ইহা প্রকাশ করিয়া একটী বিশেষ সৎকার্য্য করিয়াছেন। পূতনির্ম্মল ভগবৎপ্রেমের দিব্য প্রভায় হেমন্তের শিশিরবিন্দুগুলি ঝকিতেছে।

বামারচনা।

বর্ষা-আরতি।

ওগো মঙ্গলময়ি !
পুণ্য মধুর বরষা !
তব স্নিগ্ধ পরশে
ধরণী আজি সরসা
ওগো চমকিছে মন মম,
হৃদয়ে তুলিয়া তীব্র বেগ
আন—
তাপিত ধরা-বক্ষে
নব উৎসাহ ভরসা। ১

অয়ি চঞ্চলময়ি !
দিব্য নীলাঙ্গ ললনা !
দোলে অঞ্চল-কোলে
শান্ত শরৎ জ্যোৎস্না।
তব মত্ত মধুর পরশে
ভেক গাহে সঙ্গীত হরষে
হের—
ধায় বিপুল ভঙ্গে
ঐ ভাগীরথী যমুনা। ২

দুর্দ্দিনে, দীন ভারতের
দীনতা-করিতে দূর
ওগো নব রঙ্গিণি !
আন আনন্দ প্রচুর
বিশ্বে অতুল গৌরব জানি
মায়ের দিব্য ভাণ্ডারখানি
ওগো—
সোণার শস্যে
করে দাও ভরপুর। ৩

আজি (এ) জীর্ণ কুটীরে
তিমির-সিক্ত বসনে,
এস কল্যাণময়ি !
প্রীতিপ্রফুল্ল পরাণে।
দূরিত করগো দীনতা দুঃখ,

শীতল করিয়ে জননী বক্ষ
আন গো—
পুণ্য-শান্তি-ভরসা
নির্ম্মল জলপ্লাবনে। ৪
তব, ভীম হুঙ্কারে
পুলকে কাঁপায়ে ক্ষিতি,
পুণ্য স্নেহের কণা
ধরায় বরষ নিতি।
যেন অভিনব অনুরাগে
ওগো, বিশ্ব-হৃদয়ে জাগে,
তব
পুণ্য আশীষ ভরা
মঙ্গলময় আরতি॥ ৫

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

—

আবাহন।

তুমি এসেছ জননী ভবনে,
তাই বাজিছে বাদিত্র সঘনে।
ছিনু ঘুমঘোরে যেন গো মরণে।
চকিতে হেরিনু সোণার স্বপনে।
তুমি এসেছ জননী-ভবনে।
কে দিবে আসন তোরে যতনে।
কে করিবে ধৌত তব চরণে।
কে গাঁথিবে মালা বসে নিজনে।
অনাদরে ফুল্ল অধোবদনে।
শুখায়ে রয়েছে ঐ গৃহেরি কোণে।
বস বস তবে শারদ জননি!।
(আমি) ত্রিভুবন ঘুরে তারে খুঁজে আনি॥
সন্ধিক্ষণ যেন যায়না অমনি।
আঁধার জ্বালাই দীপমালা খানি।
শারদে মোরে বর দে এখনি॥

শ্রীনিস্তারিণী।

—

শারদোৎসব।

শান্ত নম্র স্নিগ্ধ বুকে,
পরম আনন্দে সুখে,
শরতে শারদা-মাতা ইন্দুনিভাননে।
উপনীত ধরাপরে,
অনন্ত ঐশ্বর্য্যভরে,
রাজ রাজেশ্বরীরূপে ধন বিতরণে।
করিয়ে অশেষ যত্ন,
অঞ্চল পূরিয়া রত্ন,
জননী এনেছে আজি সন্তানের তরে।
সে বারতা শুনি কাণে,
দীন দুঃখী অগণনে,
ধাইতেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে কত আশাভরে।
ভীম গরজনে দ্বারী,
ঠেলে দেয় সে ভিখারী,
প্রবেশ নিষেধ সেথা বলে উচ্চৈঃস্বরে।
মা মা বলে ডেকে ডেকে,
কণ্ঠরোধ হয়ে থাকে,
হতাশা-পীড়িত হয়ে ফিরিল কুটীরে!

শান্ত হয়ে গৃহ-কোণে,
মৌন হয়ে ভাবে মনে,
ভিখারীর ঘরে শোভা পায়কি রতন ?
দরিদ্রের উচ্চ আশা বালির ভবন॥

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সু-পথে।

যদি এ আমার নগণ্য জীবন
রহে ধূলি-মাঝে পড়ি,
নাথ! তোমার প্রেমের অমৃত-আহ্বানে
নিও মম ধুলা ঝাড়ি।
যদি কখনও হেলায় বসিয়া
তোমার বিশাল রাজ্যে,
করি মিছা খেলা দিবস রজনী,
"সেবা" নাহি হৃদে সাজে।
তখন হে আমার জগৎ-জনক !
প্রসারিয়া কৃপা-কর
নিয়ে যেও এই দীনহীন জনে
সাজাইতে "সেবা-ঘর"।
কর্ম্মের ঝঞ্ঝাৎ বাজিবে যেথায়
জাগায়ে সুপ্তির-ঘোর ;
শিরে বুলাইও আশীষ অপার
নিবিবে অলস ডোর।
তোমার অসীম এ বিশাল রাজ্যে
আমারে "সেবিকা" নিও ;
চরণের সে কোকনদ-সুধা
আমারে পূজিতে দিও।
তখন ;--ধরার কুহেলি, মোহ-মুগ্ধ হৃদি
ডুবিবে সাগর-নীরে ;
জীবনের যত নীচতা কামনা
সকল যাইবে দূরে।
শুধু,—জাগিবে হৃদয়ে,—গাঁথা রবে চির—
আমি—সেবিকা, শিষ্যা তোমারি,
তোমার বিশাল এ মহীমণ্ডলে
হে মহান্! আমি তোমারি ! !

কুমারী প্রেমকুসুম নাগ।
ময়মনসিংহ।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 567. — October, 1910

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৭ সংখ্যা। { কার্ত্তিক, ১৩১৭। নবেম্বর, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সাধু উদ্যম—পঞ্জাবের লকুয়াসিং এবং গোপালসিং দুইজন জমিদার গোজাতির উন্নতি সাধন এবং উন্নত শ্রেণীর গাভী ও বলদ উৎপাদন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৩,৩৫৩ বিঘা জমি লইয়াছেন। কৃষি বিভাগের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে গোজাতির উন্নতিসাধন বিষয়ক কার্য্য চলিবে। পঞ্জাবের জমিদারদ্বয়ের সাধু চেষ্টা, সফল হউক। বর্ত্তমান সময়ে সকল জমিদারদিগেরই এবং সর্ব্বসাধারণের এইরূপ কার্য্যের অনুসরণ করা উচিত।

নূতন আবিষ্কার—ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ বিদুষী কুমারী মুসোঁ দেবিয়ারণের সহযোগিতায় সম্প্রতি বিশুদ্ধ 'রেডিয়ম্' ধাতুর আবিষ্কার করিয়াছেন। কুমারী মুসোঁ পূর্ব্বে যে রেডিয়মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা ব্রোমাইড ও ক্লোরাইডের সহিত (সংপৃক্ত) মিশ্রিত ছিল। নব আবিষ্কৃত 'রেডিয়ম' উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, বায়ুস্পর্শে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহাতে কাগজ দগ্ধ হয়, জল বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। নব আবিষ্কৃত 'রেডিয়ম' ধাতু লৌহে সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই নূতন আবিষ্কার দ্বারা জড় বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন হইতে পারে।

তারবিহীন বৈদ্যুতালোকের আবিষ্কার—সম্প্রতি আর এক নূতন আশ্চর্য্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইয়াছে। মুসোঁ ভ্যালডেমার পাউল সেন্ নামক একজন দিনেমার তারহীন বিদ্যুদালোকের আবিষ্কার করিয়াছেন। তারবিহীন তাড়িত বার্ত্তায় যেমন সংবাদ বহনের জন্য তারের আবশ্যক হয় না, এই তারহীন বিদ্যুৎ আলোক যন্ত্রেও সেইরূপ বিনা তারে বিদ্যুদালোক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আবিষ্কারক পাউলসেন্ সম্প্রতি তাঁহার বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগের যন্ত্র হইতে অন্য কক্ষের প্রতিষ্ঠিত আলোকাধারে আলোক জ্বালিয়াছিলেন ও আলোক নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। আলোকাধার ও বৈদ্যুতিক শক্তির যন্ত্রের মধ্যে তার বা অন্য কোনওরূপ সংযোগ মিলে না। বর্ত্তমান যুগে আরও কত নূতন নূতন জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইয়া জগৎবাসীকে বিস্মিত করিবে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ—আমাদের ভাবী বড়-লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ সস্ত্রীক সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও আহারাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। আগামী ৪ঠা নবেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ মার্সিলিস বন্দর হইতে পি এণ্ড ও কোম্পানীর পার্সিয়া নামক জাহাজে করিয়া ভারতাভিমুখে রওনা হইবেন শুনা যাইতেছে, আমরা তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে শুভাগমন প্রার্থনা করি।

ট্রেণে বাধা—দার্জ্জিলিঙ্ হিমালয়ান-রেলপথ পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত। সম্প্রতি এই পথে সকালবেলা (আপ্) দার্জ্জিলিঙ্গ মেল ট্রেন চলিতেছিল, এমন সময় ড্রাইভার দেখিতে পায় সম্মুখে একটা বৃহৎ পাহাড়ের চাপ ধ্বসিয়া পড়িতেছে। তৎক্ষণাৎ ট্রেণখানিকে পিছন দিকে হটাইয়া লওয়া হয়। তাহা না হইলে, সেই পাহাড়ের চাপে গাড়ীখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। যে চাপটা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার ওজন প্রায় চৌদ্দ হাজার মন। ঈশ্বরকৃপায় ট্রেণের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। এই চাপ সরাইয়া পথ পরিষ্কার করিতে পনর ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল।

চীনরাজ্যে জর্ম্মাণ যুবরাজের অভ্যর্থনা—চীন গবর্ণমেণ্ট জর্ম্মাণ যুব-রাজকে পরলোকগত চীনসম্রাটের যে সুরম্য প্রাসাদ আছে, সেই প্রাসাদে অধিষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ঐ প্রাসাদের সহিত অন্যান্য রাজপ্রাসাদের কোনও সম্পর্ক নাই। বিদেশী ত দূরের কথা, অতি গুরু-তর প্রয়োজন না হইলে চীনের প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগকেও এই প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। চীন গবর্ণমেণ্ট যুবরাজকে কিরূপ সমাদরে অভ্যর্থনা করিবেন, এই ব্যবস্থাতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ভারতসম্রাটের মহত্ত্ব—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে একটী দুর্ঘটনার সময় রামলাল বাউরী নামক একজন কুলী আপনার প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, কয়েকটী বালক বালিকাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া-ছিল। রামলালের এই সৎ-সাহসের কথা সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের কর্ণগোচর হওয়ায়, সম্রাট্ রামলালকে তাহার সৎ-সাহসের জন্য এডওয়ার্ড মেডেল নামক পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। সম্রাটের এই মহত্ত্বে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত